যুদ্ধের ইয়োরোপ

বিক্রমাদিত্য

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—ফাল্গুন, ১৩৬৫

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক—মন্মথনাথ পান
কে. এম. প্রেস
১/১ দীনবন্ধু লেন,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ-চিত্র
সূর্য রায়

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই
বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

চার টাকা

দিস্ ইয়োরোপ!

গিরিজা মুখুজ্জে দেশে থাকতে বার দুই জেলে যান—সে কিছু না, নস্যি। (কেন বলছি, বাকিটুকু পড়লেই বুঝতে পারবেন) তারপর ছিটকে গিয়ে লণ্ডন, সেখান থেকে প্যারিস। দিব্য আছেন, সর্‌বন্ যান, ফরাসী গুণীদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে, দু পয়সা কামানও বটে। এমন সময় দেখা গেল, জর্মনরা প্যারিসের ঘাড়ে এসে পড়ল বলে। মুখুজ্জে গুটিকয়েক ফরাসী আত্মজনের সঙ্গে আর সব লক্ষ লক্ষ ফরাসীদের মতো দক্ষিণের পথ ধরলেন। পায়ে হেঁটে, মালবোঝাই বাইসিকেল কিংবা হাত-গাড়ি ঠেলে ঠেলে যখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ক্লান্তিতে ভিরমি যাবার উপক্রম (ওদিকে মনে মনে ভাবছেন, জর্মনদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন), তখন হঠাৎ মালুম হল, জর্মন বাহিনী তাঁকে পিছনে ফেলে রাতারাতি অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। তখন সামনে পিছনে সবই সমান ; ফিরে এলেন প্যারিস।

মুখুজ্জে ভারতীয়, কাজেই ইংরেজের দুশমন। কিন্তু তাহলে কি হয়—পাসপোর্টে যে পাকাপোক্ত ইস্টাম্পো মারা রয়েছে, মুখুজ্জে ব্রিটিশ প্রজা, অর্থাৎ তিনি জর্মনির শত্রু। কাজেই যদিও পাদমেকং ন গচ্ছামি করে আপন কুঠুরিতে গুবু-শাম ঘাপটি মেরে বসে থাকতেন, তবু

> একদা কেমনে জানি ভারতীয় মহাশয়
> পড়িলেন ধরা, আহা, দুরদৃষ্ট অতিশয়।*

জর্মন পুলিশের তদারকিতে ফরাসী জেলখানায় মুখুজ্জে তখন ইষ্টদেবতার নাম জপ করতে লাগলেন। সে-জেলে ইংরেজের শত্রু-মিত্র বিস্তর 'ব্রিটিশ' প্রজার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হল। তার বর্ণনাটি মনোরম।

কিছুদিন পর জেল থেকে নিষ্কৃতি পেলেন।

* সুকুমার রায়ের অচলিত কবিতা।

তখন নাম্বিয়ার তাঁকে বললেন, তাঁর সঙ্গে বার্লিন যেতে। সেখানে গিয়ে দেখেন, সুভাষচন্দ্র ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য হরেক রকম তরিবত-তত্ত্বতাবাশ আরম্ভ করে দিয়েছেন। মুখুজ্জেকে 'আজাদ হিন্দ' বেতারে বেঁধে দেওয়া হল নানা প্রকারের ব্রডকাস্টের জন্যে। সুভাষের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ যোগাযোগ হল। গ্র্যাণ্ড মুফতির সঙ্গেও বিস্তর দহরম মহরম হল।

সুভাষ সম্বন্ধে মুখুজ্জে অনেক কিছু লিখেছেন। উপাদেয়।

তারপর সুভাষ দেখলেন, বার্লিনে থেকে কাজ হবে না। ওদিকে ইংরেজ সিঙ্গাপুরে শিঙে ফুঁকেছে। জাপানীরা বর্মায় ঢুকছে। সুভাষ চলে গেলেন জাপান। এদিকে 'আজাদ হিন্দ' বেতার দড়কচ্চা মেরে গেল। মুখুজ্জেরা কিন্তু ক্ষান্ত দেননি।

তারপর জর্মনির পতন আরম্ভ হল। বোমার ঠেলায় বার্লিনে কাজ করা দায়। তাবৎ ভারতীয়কে সরানো হল হল্যাণ্ডে; সেখান থেকে 'আজাদ হিন্দের' বেতারকর্ম চালু থাকল বটে, কিন্তু মুখুজ্জেরা বুঝলেন, সময় ঘনিয়ে এসেছে। তারপর প্রায় সবাই একে একে ফিরে এলেন বার্লিন। সেখান থেকে মুখুজ্জে গেলেন দক্ষিণ-জর্মনিতে। ইতিমধ্যে রাশানরা ঢুকল বার্লিনে।

এবারে তিনি আইনত রাশার শত্রু। কারণ রাশার মিত্র ইংরেজের বিরুদ্ধে তিনি বিস্তর বেতার বক্তৃতা ঝেড়ে বসে আছেন। আইনত তিনি অ্যামেরি, হো হো'র সমগোত্র। কাজেই পালাতে হল 'নিরপেক্ষ' সুইটজারল্যাণ্ডে। এক দরদী জর্মন সীমান্ত পুলিশই তাঁকে বাতলে দিলে কি করে নিশুতি রাতে রাইন নদী সাঁতরে ওপারে যাওয়া যায়।

আমরা ভাবি, সুইসরা বড্ডই নিরপেক্ষ মোলায়েম জাত। মুখুজ্জে সেখানে যে বেইজ্জতি আর লাঞ্ছনার ভিতর দিয়ে গেলেন, তার বর্ণনা আমি আর এখানে দিলুম না।

সুইসরা মুখুজ্জেকে আত্মহত্যার দরজায় পৌঁছিয়ে হঠাৎ একদিন প্রায় 'কানে ধরে' ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দিল জর্মনিতে। জর্মনির যে অঞ্চলে তাঁকে ফেরত-ডাকে পাঠানো হল, সেটি ফরাসীর তাঁবেতে। কাজেই তাঁকে পত্রপাঠ

গ্রেপ্তার করা হল। কিন্তু মুখুজ্জে যখন কমাণ্ডাণ্টকে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি জর্মনিতে যা কিছু করেছেন, সে শুধু 'পাত্রির (দেশের) জন্য, তখন ফরাসীরা—আর এ শুধু ফরাসীরাই পারে—মুখুজ্জের বিগত জীবনটা যেন বেবাক ভুলে গেল। শুধু তাই নয়, খেতে পরতে দিল। বলল, তুমি যখন দিব্য ফরাসী জর্মন জানো, তখন আমাদের সঙ্গে থেকে কাজ করো না কেন?' তাই সই। ব্যবস্থাটা স্থানীয় জর্মনদেরও মনঃপূত হল—অবশ্যি বিজয়ী ফরাসীরা তখন তার থোড়াই পরোয়া করত—কারণ মুখুজ্জে তাদের সামনে 'দম্ভী বীরের' মূর্তিতে দেখা দেননি।

তারপর সেই ফরাসী রেজিমেণ্ট দেশে চলে গেল। মুখুজ্জের আবার জেল। ইংরেজ তখন অ্যামেরি হো হো'র মতো মুখুজ্জেকে পেলে তাঁকেও ঝোলায়।

কিন্তু ঝোলাবার সুযোগ পায়নি। ফরাসীরা মুখুজ্জেকে ইংরেজের হাতে তুলে দেয়নি।

তারপর স্বরাজ হয়ে গেল। দেশের ছেলে দেশে ফিরে এল।

* * * * *

কিন্তু বইখানা মুখুজ্জের আত্মজীবনী নয়। বইটিতে মুখুজ্জে ইয়োরোপ দেখেছেন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে, নানা পটপরিবর্তনের সামনে, পয়লা সারিতে বসে। উত্তম বই।*

[সৈয়দ মুজতবা আলী 'ময়ূরকণ্ঠী'—পৃঃ ১১৪]

আগের কথা

ইতিহাসকে নিয়ে আজকের এই কাহিনী।

১৯৪০ সাল, বিলাসের রাজধানী প্যারী। যুদ্ধের কালো মেঘ এসে দেখা দিয়েছে শহরের বুকে। প্রতিদিন নিত্যিনতুন দেশ দখল করে নিচ্ছে জার্মানি। ইউরোপে আর স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। এই সব দেশ থেকে প্রতিদিন ভেসে আসছে শরণার্থীর দল। করুণ, মর্মান্তিক তাদের কাহিনী। আশ্রয় নেই, আহার নেই, নেই ভবিষ্যৎ।

এ ছাড়া ছিলেন আর একদল যাযাবর, যাঁরা দেশ থেকে দেশে ঘুরে এই সব করুণ কাহিনী, লড়াইয়ের বিবরণী সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁরা হলেন দেশবিদেশের সাংবাদিক।

এই সাংবাদিকদের মধ্যে ছিলেন একটি বাঙালী যুবক। ভাগ্যচক্রে তাঁকে এই ঘটনার আবর্তে পড়তে হয়েছিল। তাঁর নাম গিরিজা মুখুজ্যে।

* * *

প্যারীতে গিরিজা মুখুজ্যের আগমন আকস্মিক। কল্লোলযুগের সাহিত্যিক গিরিজা মুখুজ্যে ছিলেন ছাত্র আন্দোলনের নেতা। পুলিশের শুভদৃষ্টি আর লর্ড সিনহা রোডের গুপ্তচরদের তাঁকে দৈনন্দিন এড়াতে হয়। এমনি লুকোচুরি খেলতে খেলতে যখন তিনি প্রায় ক্লান্ত, তখন একদিন তিনি সাগর পাড়ি দিলেন।

দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগ দিতে বাংলা থেকে যাচ্ছেন লিবারেল দলের নেতৃবৃন্দ—যতীন বসু, প্রভাস মিত্তির, নরেন লাহা। গিরিজা মুখুজ্যে তাঁদের সঙ্গ নিলেন—প্রতিনিধি হিসেবে নয়, সাহায্যকারী হিসেবে।

* * *

জীবন ঘোরে ভাগ্যের চাকায়।

গিরিজা মুখুজ্যেরও ঘুরল। মালদর গিরিজা মুখুজ্যে লণ্ডনে আসর জমিয়ে বসলেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজ নিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি, লেখা, বইপত্তরের কাজ।

এর পরের কাহিনী প্যারীতে—সরবোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপর প্রাহাতে—অধ্যাপনার কাজ নিয়ে গিরিজা মুখুজ্যে এলেন।

ঘটনার সময় জুন ১৯৩৮। ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক সন্ধিক্ষণ। নতুন ভাবে গড়ে উঠছে যুদ্ধে বিধ্বস্ত জার্মানি। এক নতুন নেতার অভ্যুদয় হয়েছে সেখানে। প্রতিদিন তাঁর হুংকার শোনা যায় দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি। চারদিকে শুরু হয়েছে লড়াইয়ের আয়োজন।

আতঙ্কিত হয়ে ইংরেজ সরকার প্রাহা থেকে তাঁর প্রজাদের সরিয়ে নিলেন। গিরিজা মুখুজ্যে ভারতীয়, ইংরেজের প্রজা। অতএব তাঁকেও প্রাহার মায়া ত্যাগ করে লণ্ডনে আসতে হল।

*　　　*　　　*

লণ্ডনে তখন ছিলেন দিল্লীর হিন্দুস্থান টাইমসের সম্পাদক দেবদাস গান্ধী।

একদিন দেবদাস গান্ধীর সঙ্গে গিরিজা মুখুজ্যের দেখা। কথায় কথায় দেবদাস গান্ধী বললেন, প্যারীতে যাবে হে গিরিজা, আমার কাগজের প্রতিনিধি হয়ে?

গিরিজা মুখুজ্যে তখন ভবঘুরে, উদ্দেশ্যবিহীন। তাই এক কথায় দেবদাস গান্ধীর প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন।

*　　　*　　　*

প্যারীর জীবনের উপর ভিত্তি করে আজকের কাহিনী। এ কাহিনীর কিছুটা গিরিজা মুখুজ্যে তাঁর কাগজে লিখেছিলেন। বাকীটা ছিল তাঁর মনে গাঁথা। লড়াইয়ের দুর্যোগে লেখা আর হয়ে ওঠে নি। বিশেষ করে আজাদ হিন্দ ফৌজের কাহিনী।

আজকে এই সব সাত-পাঁচ মিশিয়ে গিরিজা মুখুজ্যের কাহিনী লেখা হল।

*　　　*　　　*

এক

দূর আকাশ থেকে বাঁশির তীব্র ধ্বনি ভেসে এল। সে ধ্বনি সঙ্গীতের লহরী নয়, মৃত্যুর আহ্বান, অজানার ডাক।

শূন্য আকাশে মিলিয়ে গেল জনতার পদধ্বনি, স্তব্ধ হল জনকল্লোল। শুধু পড়ে রইল শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি অতীতের ঐতিহাসিক স্মৃতি, মানুষের গর্বের ম্লান চিহ্ন।

জুন মাসের প্যারী, ১৯৪০ সাল। যুদ্ধের কালো মেঘ এসে দেখা দিয়েছে শহরের বুকে। ভয়ার্ত হয়ে উঠেছে প্যারীর নাগরিক।

আমি সাংবাদিক, আমার জানবার আকাঙ্ক্ষা অপরিসীম। তাই মৃত্যুর সংকেত আমায় চঞ্চল করে তোলে না বরং জানবার ব্যাকুলতা বাড়ায়।

* * *

শহরের এক প্রান্তে, মঁপারনাসের রেস্তরাঁন্তে বসে ছিলাম। বাঁশির সুরের রেশ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রেস্তরাঁন্ত খালি হয়ে গেল। মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবার আশায় সবাই আশ্রয় খুঁজছে। দোকানের মালিক এবার সজোরে ঘোষণা করলেন, দোকান বন্ধ হবে।

আমি করুণ অসহায় দৃষ্টিতে রাস্তার পানে তাকালাম। দেখতে পেলাম জনস্রোত ছুটে চলেছে মঁপারনাস স্টেশনের পানে।

ভাবি, আমি কোথায় যাই? আমি ভিনদেশের লোক—সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে আমার ঘর। আজ ঘটনার চক্রে পড়ে আমি প্যারীর বাসিন্দা। সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ আমার পেশা। এই দুর্যোগে আমার ঠাঁই কোথায়? ভাবলাম, উত্তেজনার মধ্যে থাকে আমার সংবাদের রসদ, বিপদের মধ্যে আমার জীবিকা। অতএব বিপদকে এড়ালে চলবে কেন?

সব কথা ভেবে আমার মনে সাহস এল। এয়ার রেডের সংকেতধ্বনিকে অগ্রাহ্য করে পাইপ মুখে দিয়ে এগিয়ে চললাম।

হঠাৎ দূর আকাশ থেকে গুরুগম্ভীর শব্দ ভেসে এল—গুম্‌ গুম্‌ গুম্‌ বোম্বার শব্দ। তারপরেই অ্যান্টি-এয়ারক্রাফটের ধ্বনি—কট্‌ কট্‌ কট্‌।

বুঝতে অসুবিধে হল না লড়াই শুরু হয়ে গেছে আকাশের বুকে।

আমি মনে মনে বললাম, 'ভিভ লা ফ্রান্স।'

*　　　　*　　　　*

বিপদে মানুষ হারায় চিন্তাশক্তি। কিন্তু আমি হারিয়েছিলাম পথ। জনতার কোলাহল, বোমার আওয়াজে প্রথমটায় বেশ হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম।

একটু বাদেই আবার সাইরেনের তীব্র আওয়াজ জনতাকে জানিয়ে গেল 'অল ক্লীয়ার।' খাঁচা থেকে জনতা আবার রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ল।

আমার সন্ধানী মন। লড়াইয়ের ফলাফল জানার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। তাই বিপদ সংকেত শেষ হবার পর সোজা চলে এলাম 'আজান্স ফ্রান্স' সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানে।

বিরাট দপ্তর। সবাই কাজে ব্যস্ত। কথা বলবার সময় নেই, বিশেষ করে বোমাবর্ষণের পর। আমার পরিচিতা এক সবএডিটর ডিউটিতে ছিলেন। আমায় দেখে প্রায় চীৎকার করে বললেন, মুখুজ্যে! কী খবর? বেঁচে আছ?

হেসে জবাব দিই, এ যাত্রায় বেঁচে গেছি। তারপর খবরাখবর কী? বোমাটা কোথায় পড়ল?

বান্ধবী জবাব দেন, না ক্ষতির পরিমাণটা বিশেষ নয়। শুধুমাত্র রেনোর মোটর কারখানাটা ধ্বংস হয়ে গেছে।

সরকারী বিবৃতিতে থাকে গতানুগতিক খবর, আর বিশেষ সংবাদদাতার ডেসপ্যাচে থাকে চাঞ্চল্য। অতএব সেই চাঞ্চল্যকর কাহিনী রচনা করতে যে রসদের দরকার সেইটুকু বান্ধবীর কাছ থেকে জেনে নিই।

বাড়িতে এসে টাইপরাইটার নিয়ে বসি। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, জার্মান বিমানবাহিনীর হানা। মেশিন আর মন চলে দ্রুতগতিতে।

আমি লিখতে থাকি : প্যারী, ১৯৪০, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে........

বাইরের জগতের কাছে এই আমার শেষ নিউজ ডেসপ্যাচ।

* * *

একটানা কতোক্ষণ লিখেছি মনে নেই। লেখা শেষ করে জানালার সামনে এসে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে আবৃত প্যারী নগরী, আলো নেই, নেই জনমানব, নেই কোলাহল। এ যেন মৃত্যুনগরী। শুধু দূর আকাশে মিটি মিটি করে তারা জলছে।

আমার মনে পড়ে অতীতের কথা—একটা জাতির পতন ও উত্থান। ধ্বংস থেকে অগ্রগতির পথে।

সে বহুদিনের আগের কথা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর, ভের্সাই সন্ধির শেষে··· প্রথম মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত জার্মান দেশ।

দেশের জনতা হয়ে আছে নিস্তেজ, নিরাশ। অন্ধকার ভবিষ্যতের মধ্যে দিয়ে তারা এগিয়ে চলেছে। যুদ্ধের হিসেবনিকেশ মেলাতে দেশবাসীরা হয়েছে ক্লান্ত।

এমনি সময় দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে এক আলোড়ন শুরু হল।

এক নতুন দল, এক নতুন নেতা নিয়ে এল দেশবাসীর কাছে আশার বাণী। ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে, আর নয়। ঋণ থেকে এবার জার্মানিকে মুক্তি দিতে হবে। নতুন নেতা জাতে অষ্ট্রিয়ান। লেখাপড়া বেশীদূর করেননি বটে কিন্তু আকাঙ্ক্ষা আছে। দূরদর্শিতা ছিল না বটে কিন্তু লোক ভোলাবার পারদর্শিতা আছে।

নতুন দলের নাম ন্যাশনালিস্ট সোসালিস্ট, সংক্ষেপে নাৎসী।

নাৎসী বাহিনীর কার্যকলাপ দেখে দেশের সরকার হতভম্ব, জনসাধারণ মুগ্ধ।

অতএব সমর্থন এল দেশের চারিদিক থেকে। ধনী, গরিব, ব্যবসাদার, মজুর সবাই এসে দলের সঙ্গে হাত মেলালেন।

প্রথম দাবি, ক্ষতিপূরণ বন্ধ করো।

যেই কথা, সেই কাজ। ক্ষমতা পেয়ে নাৎসী দল তাদের প্রথম মনস্কামনা পূর্ণ করলে।

তারপর শুরু হল ইহুদী উচ্ছেদ। নাৎসী দলের বক্তব্য, আর্যজাতির বংশধর তারা। তাদের সঙ্গে ইহুদীরা মিশে জাতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মান জাতির পরাজয়ের কারণ ইহুদী জাতি। অতএব তাদের এ দেশ থেকে সরাতে না পারলে শান্তি নেই। জয়ের পর জয়, ক্ষমতার পর ক্ষমতা হাতে পেল নাৎসী দল, আর সেই দলের নেতা অ্যাডলফ হিটলার।

*　　　　*　　　　*

ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন থাকে তখন মরুভূমিও মরূদ্যান হয়।

হিটলারেরও তাই হল।

তাঁর আকাঙ্ক্ষার কাছে সমস্ত বাধা বিপত্তি সহজ হয়ে গেল। শত্রুর হল পরাজয়। প্রতিদিনই তাঁর বন্ধুর সংখ্যা বাড়ে, আর সেই সঙ্গে হাতে আসে ক্ষমতা। তাঁর আদর্শের উপর ভিত্তি হল দেশের নীতি।

আকাঙ্ক্ষা হল নেশা, আর সে নেশা মানুষকে পাগল করে তোলে। হিটলারেরও হল তাই। দেশের মধ্যে অপ্রতিহত ক্ষমতা পেয়ে এবার তিনি নজর দিলেন বিদেশের পানে।

জার্মানির গায়ে লেগে আছে একটি ছোট দেশ—নাম তার অস্ট্রিয়া। হিটলারের মাতৃভূমি। এক ভাষা, এক দৃষ্টি, এক চিন্তাধারা।

একদিন হিটলার সৈন্যসামন্ত নিয়ে অস্ট্রিয়া দখল করলেন।

আতঙ্কের ছায়া পড়ল বিদেশী শক্তির মাঝে। এর পরে সবাই স্তম্ভিত হয়ে দেখতে পেল যে জার্মান সৈন্যবাহিনী এগিয়ে চলেছে চেকোস্লোভাকিয়ার পানে। তারপর কয়েকদিনের মধ্যে দেশের স্বাধীন অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেল।

এবার শুরু হল পোল্যাণ্ডের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা।

হিটলারের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী হের ফন্ রিবেনট্রপ। চতুরচূড়ামণি, প্রবল ইংরেজবিদ্বেষী।

একদিন পোল্যাণ্ডের রাজদূতকে তিনি ডিনারে আমন্ত্রণ করলেন।

খানাপিনা, গল্পগুজব হল। কথায়-কথায় রিবেনট্রপ বলে বসলেন : পোল্যাণ্ডের বন্দর ডানৎসিগ আমাদের চাই।

রিবেনট্রপের কথা শুনে রাজদূত তো হতভম্ব। লোকটা বলে কী?

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসে রাজদূত দেশের সরকারকে জানালেন রিবেনট্রপের আব্দারের কথা।

পোল্যাণ্ড সরকারও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

স্পষ্ট জানালেন : বিনা যুদ্ধে নাহি দেব এক সূচ্যগ্র ভূমি। ডানৎসিগ চাও তো লড়াই করো। পোল্যাণ্ডকে সমর্থন জানালেন ইংরেজ সরকার। ফরাসী সরকারও এই জবাব অনুমোদন করলেন।

পোল্যাণ্ডের জবাব আর ইংরেজ ও ফরাসী সরকারের সমর্থনের কথা শুনে হিটলার তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।

চীৎকার করে বললেন : 'ব্যাটাদের এতদূর স্পর্ধা। দাঁড়াও, তোমাদের আমি গরম জলে সেদ্ধ করে মারব।'

*　　*　　*

এবার তিনি ফিকিরে থাকেন কী করে লড়াইটা বাধানো যায়। কিন্তু বড়ো রকমের একটা যুদ্ধ তিনি চান না। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে লড়াই করতে তাঁর আপত্তি নেই কিন্তু ইংরেজ ও ফরাসী সরকারের সঙ্গে হাতাহাতি করতে মন চায় না। তাই ভাবেন এমনি ভাবে এই কাজটা হাসিল করতে হবে যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। অর্থাৎ পোল্যাণ্ড দখল হয়—কিন্তু বড়ো রকমের একটা লড়াই না হয়।

এবার শুরু হল দাবার চাল।

হিটলারের পরম বন্ধু মুসোলিনি। বলতে গেলে ইতালির ভাগ্যবিধাতা। দুই বন্ধুতে রফা হল ইউরোপের ভাগ্য নিয়ে।

এর পর হিটলার নজর দিলেন রাশিয়ার পানে।

*　　*　　*

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি। পররাষ্ট্র-মন্ত্রী হের ফন্ রিবেনট্রপ একদিন এসে

হাজির হলেন মস্কোতে। গোপনে আগমন—কাকপক্ষীর জানবার উপায় নেই।

রাশিয়ার সর্বময় কর্তা তখন স্টালিন।

হিটলার ও স্টালিনে তখন অহি-নকুল সম্পর্ক। কেউ কাউকে বিশ্বাস করেন না অথচ দুজনেরই দুজনাকে প্রয়োজন। তাই মিতালির প্রস্তাব নিয়ে হের রিবেনট্রপ এসে হাজির হয়েছেন রাশিয়ার রাজধানীতে।

প্রবাদ আছে, লাখ কথার পর বিয়ে হয়। রিবেনট্রপ ও স্টালিনের মধ্যে কত কথা হয়েছিল তার হিসেব নেই—কিন্তু কয়েকদিন বাদে দেখা গেল জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে বন্ধুত্ব শুরু হয়েছে। মস্কোতে বসে রিবেনট্রপ বন্ধুত্বের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে এলেন।

সারা জার্মান দেশে তুমুল সোরগোল পড়ে গেল। রাশিয়া যখন বন্ধু তখন জার্মানিকে আর পায় কে? সমস্ত দেশব্যাপী নাৎসী নেতারা গাইতে লাগল—'ডয়েচল্যাণ্ড উইবার আলেস'—।

জার্মানি ও রাশিয়ার মিতালি মিত্রশক্তির মধ্যে এক নতুন আতঙ্কের সৃষ্টি করলে।

লণ্ডনের ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে ইংরেজ বড়োকর্তারা গালে হাত দিয়ে বসলেন। ব্যাপারটা ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠছে। এভাবে চললে একটা লড়াই অবশ্যম্ভাবী।

তখন সেপ্টেম্বর মাস, ১৯৩৯ সাল। সমস্ত জগৎবাসী উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকিয়ে আছে লণ্ডন ও বার্লিনের পানে।

এমনি সময় একদিন শুনতে পাওয়া গেল জার্মান পদাতিক বাহিনী এগিয়ে চলেছে পোল্যাণ্ডের দিকে।

৩রা সেপ্টেম্বর ভোরবেলা।

রিবেনট্রপকে নিয়ে হিটলার আলোচনা করছেন। পাশের ঘরে বসে আছেন অন্যান্য নাৎসী নেতৃবৃন্দ—গোয়েরিং, গোয়েবলস…।

এমনি সময় পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মচারী স্মিট একটি জরুরী চিঠি নিয়ে এলেন। ইংরেজ রাজদূত মাত্র কিছুক্ষণ আগে চিঠিখানাকে জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরে দিয়ে গেছেন। ইংরাজীতে লেখা, এতে আছে ইংরেজ সরকারের মতামত।

অনুবাদকের কাজ করলেন স্মিট। অর্থাৎ চিঠিখানার তর্জমা করে হিটলারকে পড়ে শোনালেন। কারণ হিটলার না জানেন ইংরেজী, না ফরাসী।

সংক্ষিপ্ত চিঠি কিন্তু কঠিন তার বক্তব্য।

চিঠিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে : পোল্যাণ্ড আক্রমণ ইংরেজ সরকার কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না। অর্থাৎ এ আক্রমণ যদি কার্যকরী হয়, তবে এ চিঠি হল ইংরেজ সরকারের আলটিমেটাম। অর্থাৎ ইংরেজ ও জার্মানির ভেতর লড়াই অবশ্যম্ভাবী।

*　　　*　　　*

চুপ করে হিটলার স্মিটের তর্জমা শুনলেন। রিবেনট্রপও নির্বাক।

পোল্যাণ্ডের হয়ে ইংরেজ লড়াই করবে, অবশ্যি যদি প্রয়োজন হয়। এতটা কিন্তু হিটলার আশা করেন নি। তাই খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে রিবেনট্রপকে প্রশ্ন করেন : তারপর ? এবার কী হবে ?

আস্তে আস্তে রিবেনট্রপ জবাব দেন : এবার ফরাসীদের বলবার পালা। তাদের কাছে থেকে এবার আলটিমেটাম আশা করতে পারি।

ইংরেজ সরকারের আলটিমেটামের কথা পাশের ঘরে গোয়েরিংএর কানে গেল। কথাটা শুনে তিনি স্তম্ভিত হলেন। ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন : ঈশ্বর আমাদের রক্ষে করুন। এ লড়াইয়ে পরাজয় হলে দেশের কী পরিণাম হবে এ আমি কল্পনা করতে পারছি নে।

গোয়েবলস নির্বাক। তিনি হয়তো ভাবছিলেন তাঁর অদৃষ্টের কথা।

*　　　*　　　*

পরদিন প্রভাতে শোনা গেল, ইংরেজ ও ফরাসী জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এই হল প্রথম অঙ্ক।

*　　　　*　　　　*

ঝড়ের বেগে জার্মান পানজার সৈন্যবাহিনী পোল্যাণ্ড দখল করে নিল।

যুদ্ধ এত তাড়াতাড়ি শেষ হল যে হিটলার নিজেও অবাক হয়ে গেলেন।

পোল্যাণ্ড তো পাওয়া গেল, তারপর? হিটলারের মনে গোপন আশা যে এবার হয়তো ভয়ে ভয়ে ইংরেজ ও ফরাসীরা সন্ধির প্রস্তাব করবে।

দিন গেল—মাসও উত্তীর্ণ হল, কিন্তু সন্ধির কোন আশাই দেখা দিল না।

এক মিত্রশক্তির মারফত হিটলার ঝগড়া মেটাবার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার সে প্রস্তাব কানে তুললেন না। লড়াই চলবে, যতদিন না জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়।

বাধ্য হয়ে হিটলারকে আবার যুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়ে বসতে হল।

ইংরেজের গোঁ দেখে তাঁর বেজায় রাগ। এর উপযুক্ত শাস্তি তিনি তাঁদের দেবেনই। এই তাঁর পণ।

*　　　　*　　　　*

হিটলারের পরামর্শদাতা জেনারেল কাইটেল, জেনারেল হালদার, জেনারেল ব্রাউসিস্ত্। সৈন্যবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। স্বয়ং হিটলার হলেন আর্মির সুপ্রীম কম্যাণ্ডার।

প্রথমে সবাই মিলে ভাবতে শুরু করলেন কী করে ফ্রান্সকে আক্রমণ করা যায়। কাজটা সহজ নয়, কারণ ফ্রান্সকে ঘিরে আছে এক দুর্ভেদ্য ব্যূহ—নাম তার ম্যাজিনো লাইন। এ ব্যূহ ভেদ করা প্রায় অসম্ভব বলা যেতে পারে।

তারপর একদিন সত্যিই ফ্রান্স আক্রমণ হল। প্যারীর আকাশের বুকে দেখা দিল জার্মান বিমান বাহিনী।

তখন জুন মাস। আমি বসে ছিলাম মঁপারনাসের এক অখ্যাত রেস্তরাস্তে…

আজ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আমার অতীতের এই কথাগুলো মনে হচ্ছিল।

*　　　　*　　　　*

দুই

বোমা বর্ষণের পর প্যারীর বাসিন্দারা রীতিমতো বিচলিত হয়ে পড়ল। দিনের পর দিন তারা দেখেছে অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ডের ধ্বংস। শুনেছে শরণার্থীদের করুণ কাহিনী। আজ শত্রু এসে হানা দিয়েছে ফ্রান্সের দরজায়। তাই আজ তারা ভীত।

সেদিন থেকে শুরু হল শরণার্থীদের মিছিল। সকাল থেকে রাত অবধি একটানা চলল জনতার স্রোত। অজানা, অচেনার উদ্দেশ্যে ভয়ার্ত মানুষ এগিয়ে চলেছে।

আমি বিদেশী, প্যারী শহরের প্রেমিক। তাই জনসাধারণের উত্তেজনা আমাকে বিচলিত করে নি। থিয়েটারের দর্শকের মতো আমি এই জনস্রোত দেখি। হাসি আর ভাবি—হায় রে মানুষ, বৃথা এ নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টা।

আমার অবিচলিত মনোভাব দেখে বন্ধুরা বিস্মিত। সদলবলে এসে জিজ্ঞেস করেন: তোমার কী প্ল্যান মুখুজ্যে? আমরা তো চললুম। হেসে উত্তর দিই: যাও। মালাচন্দন নিয়ে স্টেশন অবধি তোমাদের এগিয়ে দেব।

আমার জবাব শুনে তারা ভাবে হয়তো আমি পাগল হয়ে গেছি। তাই একটু ধমকের কণ্ঠস্বরে বলে: কী বাজে বকছ। এই তো লড়াই। হাসি ঠাট্টা নয়। তুমি ইংরেজের প্রজা। একবার জার্মানদের হাতে বন্দী হলে দুর্গতিটা কী হবে ভেবে দেখছ কী?

ওদের ধমক শুনে চুপ করে যাই। বন্দী হবার আতঙ্ক কারও কাছে ব্যক্ত করি নে। শুধু হেসে বলি, দেখা যাবে।

স্টেশনে যথারীতি সবাইকে তুলে দিলাম। অন্তরঙ্গ বন্ধুরা বললেন: বিপদ একটু বেশী দেখলেই চলে এসো।

* * *

*　　　　*　　　　*

হঠাৎ একদিন মাদাম রোজেরের কথা মনে হল। মাদাম রোজের আমার বিশেষ পরিচিতা। বয়সের অভিজ্ঞতা আছে। অতএব তাঁর পরামর্শ মূল্যবান।

আমায় দেখে মাদাম রোজের বেজায় খুশী। তাঁর ছেলে ফ্রাঙ্সোয়া ও মেয়ে মারী আমায় দেখে দৌড়ে এল। বললে, জান মুখুজ্যে, আমরা প্যারী থেকে চলে যাবার আয়োজন করছি। যাবে, আমাদের সঙ্গে ?

অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব। শুনে মনটা খুশী হল। ব্যাপারটা খুলে বললেন মাদাম রোজের। প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তখনও তাঁর মনে রঙীন হয়ে আছে। লড়াই, ধ্বংস ও মৃত্যু তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। এ যুদ্ধের পরিণামও তাঁর জানা আছে।

মাদাম রোজের বললেন, জান মুখুজ্যে, ছেলেমেয়েদের শহরের বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। শত্রু শহরে এলে প্রাণ নিয়ে বাস করা দায়। আমরা বুড়ো মানুষ, জীবনপ্রদীপ প্রায় নিভে এসেছে। অতএব আমাদের পক্ষে বিশেষ আসে যায় না। কিন্তু ফ্রাঙ্সোয়া ও মারী, ওদের বাঁচতে হবে। তাই ওদের প্যারী থেকে দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রাঙ্সোয়া বলে, চলে এসো মুখুজ্যে আমাদের সঙ্গে।

আমি তখন উদ্দেশ্যবিহীন, ভবঘুরে। তাই ফ্রাঙ্সোয়ার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম।

*　　　　*　　　　*

'টু গো অর নট টু গো।'

আমার মনের সংশয় তখনও কাটে নি। মন থেকে প্যারীর মোহ দূর হয় নি। দেহ চায় প্যারীর বাইরে যেতে কিন্তু মন চাইছে শহরে থাকতে। ফ্রাঙ্সোয়াকে কথা দিয়েছি তাদের সঙ্গে যাব অথচ আজ যেতে যেন দ্বিধা হচ্ছে।

ভাবনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে নাম্বিয়ারের শরণাপন্ন হলাম।

নাম্বিয়ার আমার মতোই একজন ভারতীয় সাংবাদিক। কলকাতার এক পত্রিকার প্যারীর বিশেষ সংবাদদাতা।

আমার মতো তারও নিরুপায় অবস্থা। অতএব আমার মনের কথা খুলে বলতেই চীৎকার করে বললে, ব্রাভো, আমিও হব তোমার পথের সঙ্গী।

এর পরে শুরু হল জল্পনা-কল্পনা।

লার্তিন কার্তিয়ে 'কাফে মাইউ'তে ভারতীয়দের আড্ডা। দুজনে গিয়ে সেইখানে কফি নিয়ে বসলাম। একটু বাদে আর এক ব্রেজিলিয়ান সাংবাদিক এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনিও আমাদের সঙ্গ নিতে চান।

তারপর যাত্রার আয়োজন পাকাপোক্ত করে বাড়ি এলাম।

* * *

নানা মুনির নানা মত। এ ক্ষেত্রেও তাই হল।

নাম্বিয়ারও তার মত পালটালে শিগগির। পরদিন সে খবর পাঠালে যে আর এক বন্ধুর সঙ্গে যাত্রা করেছে। অর্থাৎ আমার পথ আমাকেই দেখতে হবে।

আমি ভাবতে বসে গেলাম। একা যাব, না ফ্রাঁসোয়াদের সাথে। শেষটায় ভাবি, বিপদে সঙ্গী থাকা ভালো। অতএব আবার মাদাম রোজেরের বাড়িতে ফিরে এলাম।

যাত্রার আয়োজনের ত্রুটি নেই। এ যেন পিকনিক পার্টি। এটা নাও, ওটা রাখো, করতে করতে আরও সবাই হিমসিম খেয়ে গেলাম। মাদাম রোজের স্বয়ং তত্ত্বাবধান করছেন। নিজের হাতে তাঁর মূল্যবান বিষয়-সম্পত্তি তুলে দিচ্ছেন ছেলেমেয়েদের হাতে। শত্রু এলে কী হবে বলা তো যায় না। তাই সময় থাকতে সতর্ক হওয়া ভালো।

আমার জিনিস বলতে গেলে কিছু নেই বললে চলে। শার্ট, মোজা, টয়লেট, ইত্যাদি ইত্যাদি। একবার লোভ হল টাইপরাইটারটা সঙ্গে নেবার, কিন্তু ভবিষ্যৎ ভেবে প্রলোভন সামলে নিলাম।

লোভ সামলাবার আর একটা কারণ ছিল। যাত্রার নিতান্ত আবশ্যকীয় জিনিস আর হালকা মালপত্র নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলাম।

গত কয়েকটা দিনে আমি ভয়ার্ত নাগরিকদের রিক্ত হাতে পালাতে দেখেছি। ট্রেন নেই, মেট্রো স্টেশনে সহস্র তীর্থযাত্রীর মতো জনতা, সকাল সন্ধ্যা শহরের বাইরে ছুটে চলেছে ভয়ার্ত নাগরিক। সবাই আজ রিক্ত, সম্পদ-হীন। কারণ আজকে সবার প্রাণ বাঁচাবার প্রয়োজন, জিনিসের নয়। এই অসংখ্য জনস্রোত দেখে আমার অতীতের এক স্মৃতি মনে পড়ে।

১৯২২ সাল। উত্তর বাংলায় বন্যা। সেই বন্যার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে মানুষ নিরাপদের সন্ধানে। কী রেখে গেল, কী সঙ্গে নিল তার হিসেব-নিকেশ করে নি। শুধু জীবনের যাচাই করেছে।

আজকের প্যারীর বিশাল জনতাও নিরাপত্তার সন্ধানে ছুটে চলেছে।

আমিও তাদের একজন।

* * *

লড়াইয়ের সবচাইতে বড়ো অস্ত্র গুজব।

সত্যের অপচয়, মিথ্যার জয়জয়কার।

এবারও তার ব্যতিক্রম হয় নি। যা ছিল কল্পনার বাইরে, গুজব তাই সম্ভব করল। ফ্রান্সের বোমাবর্ষণের দু-একদিনের পর থেকে দেশের সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে গেল। তাই দেশবাসীকে নির্ভর করতে হল বেতার-প্রচারিত সংবাদের উপর। টাটকা খবর শোনবার জন্য সবাই লালায়িত। আমিও তাদের একজন।

প্যারী ত্যাগ করার আগে লড়াইয়ের পরিস্থিতি জানবার আকাঙ্ক্ষা হল। মাদাম রোজেরের বাড়ি থেকে এলাম আর্ক দ্য ত্রিয়ম্ফের কাছে। তারপর সাঁ জেলিসি দিয়ে হাঁটা দিলাম প্লাস দ্য কংকর্দ পানে। একটু দূরেই লা ফিগারর সংবাদপত্রের দপ্তর।

আজ সেই দপ্তর নিস্তব্ধ। দূর থেকে দেখলে মনে হয় প্রেতপুরী। দপ্তরের

সামনে এসে দেখলাম কাগজ বেরোয় না বটে কিন্তু দপ্তরের সামনে একদল লোক জটলা করছে। তাদের আলোচনার অসংলগ্ন দু-একটা কথাও আমার কানে ভেসে এল। মুখরোচক আলোচনা অর্থাৎ যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে তর্ক বিতর্ক। সবারই মতামত যে, লড়াইয়ে মিত্রশক্তির জয়লাভ সুনিশ্চিত।

কে একজন কণ্ঠস্বর উঁচু করে বললে, জয় আমাদের হাতের মুঠোয়। আমেরিকা লড়াইয়ে যোগ দিয়েছে। এবার ছাখো না মজাটা।

শ্রোতার দল উদগ্রীব কণ্ঠে একসঙ্গে প্রশ্ন করে, আমেরিকা যোগ দিয়েছে? কোন পক্ষে?

বক্তা নিরলস কণ্ঠে উত্তর দেন, তা আবার বলতে। মিত্রশক্তির পক্ষে। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

'ভিভ লা ফ্রান্স'।

এমনি সময় দূর আকাশ থেকে বিমানের গর্জন শুনতে পেলাম। তার আওয়াজে লোকটার সব কথা আমার কানে এল না। শুধু আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল জার্মান বিমান বাহিনী।

আমিও বলতে যাচ্ছিলাম 'ভিভ লা ফ্রান্স।'

কিন্তু বলা আর হয়ে উঠল না। তাড়াতাড়ি মাদাম রোজেরের বাড়ি ফিরে এলাম।

*　　　　*　　　　*

নাটকের শেষে বিদায়ের করুণ দৃশ্য বা অশ্রুপাত, কাহিনীকে জমিয়ে রাখে। কিন্তু আজকের নাটকের প্রথম অঙ্কেই ছিল বিদায়ের পালা—ও মাদাম রোজেরের কান্না। এ যাত্রার পরিণাম মাদাম রোজেরের অজানা নেই। তিনি জানেন এ হল জীবনের শেষ দেখা। ক্ষণিকের বিদায় নয়, চিরদিনের।

চোখের জল মুছে আমরা সবাই বিদায় নিই। দেরি করার জো নেই। শত্রুর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে প্যারী নগরীর বাইরে। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

আমরা যখন রওনা হলাম তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। দীপ্তিহীন, অন্ধকার প্যারীর সুপ্রশস্ত রাস্তা। এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত কিছুই দেখা যায় না। সতর্ক ধীর গতিতে মানুষ চলাফেরা করছে।

আজ সাঁ জেলিসির রূপ নেই। স্তব্ধ হয়েছে জনতার কলরব। অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্ট দেখা যায় প্লাস দ্য লা কংকর্দ—মারী আঁতোয়ানেতের শেষ বিচারের স্থান। আর একটু দূরে, নদীর অপর প্রান্তে এঁভেলিদ, নাপোলিওঁর সমাধিস্থান।

যে প্যারীর হুঙ্কারে একদিন সমস্ত পৃথিবী কেঁপে উঠত আজ সে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

আমরা যাত্রী চারজনা—ফ্রাসোয়া, মারী, ফ্রাসোয়ার প্রেয়সী মনিকা ও আমি, গিরিজা মুখুজ্যে। শহরের অন্ধকার ভেদ করে আমরা ছুটে চলি অজানার উদ্দেশে।

একটু বাদে আমরা শহরের প্রান্তে এসে পৌছলাম। দূরে আইফেল তুরের চূড়া অস্পষ্ট দেখা যায়। তার পানে তাকিয়ে আমি মনে মনে বললাম, বিদায় প্যারী!

তিন

আমরা যখন প্যারী থেকে বেরুচ্ছি তখন ঝড়ের গতিতে জার্মান সৈন্য-বাহিনী প্যারীর দিকে এগিয়ে আসছে।

পোল্যাণ্ড দখল করে হিটলার কয়েকদিন চুপচাপ বসে ছিলেন! ভাবছিলেন, কী করে ফ্রান্স আক্রমণ করা যায়।

সৈন্য বিভাগের বড়োকর্তাদের প্রতি তাঁর কোন বিশ্বাস নেই। কোনদিন ছিলও না। নিজের হাতেই তিনি সব করেন। কাজেই ফ্রান্স আক্রমণের প্ল্যান করতে তিনি বসে গেলেন।

এ কাজটা সহজ নয়। কারণ ফরাসী দেশের চারদিক ঘিরে আছে ম্যাজিনো লাইন। এ ব্যূহ ভেদ করতে হলে অনেক তেল খড় পোড়াতে হবে।

বহুদিন ধরে হিটলার মনের ভেতর আক্রমণের এক কল্পনা ছিল। সে হল শ্লিফেন প্ল্যানের।

শ্লিফেন ছিলেন এক বিখ্যাত জার্মান সেনাপতি। তাঁর পরিকল্পনাটা ছিল যে শত্রুর দক্ষিণ ভাগ আক্রমণ করা। কিন্তু হিটলার ভেবেচিন্তে দেখলেন যে এ ক্ষেত্রে প্ল্যান অনুযায়ী করতে গেলে ক্ষতি হবে বিস্তর।

তাই এ প্ল্যান নিয়ে তিনি ইতস্তত করছিলেন।

* * *

হিটলার যখন শ্লিফেন প্ল্যান নিয়ে পাঁয়তারা কষছেন তখন জার্মান বাহিনীর এক অখ্যাত সেনাপতি এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনার কথা ভাবছিলেন।

এই জার্মান সেনাপতি ছিলেন বিখ্যাত জেনারেল ফন রুনস্টাডের চীফ অব দি স্টাফ জেনারেল ফন ম্যানস্টাইন।

সমস্ত দিক ভেবেচিন্তে ম্যানস্টাইন দেখলেন যে ম্যাজিনো লাইনের একটি মাত্র দুর্বল জায়গা আছে। সে হল আর্দেনস, লাক্সেমবুর্গ ও বেলজিয়ামের

মাঝামাঝি এক পর্বতসঙ্কুল জায়গা। একবার এই পর্বতমালা পার হতে পারলে চ্যানেলের বন্দর পৌছানো মাত্র কয়েকদিনের কাজ।

বন্ধুদের কাছে ম্যানস্টাইন এই প্ল্যানের কথা বললেন। সবাই বিস্মিত হয়ে বলেন, পাগল হয়েছ। আর্দেনসে ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে আক্রমণ অসম্ভব। তার উপর প্রচণ্ড শীতে সারাটা পাহাড় বরফে জমে থাকে।

সেনাবাহিনীর হাই কম্যাণ্ড ম্যানস্টাইনের প্ল্যানের কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন।

ম্যানস্টাইনের প্ল্যানের কথা ক্রমে ক্রমে হিটলারের কানে গেল। অমনি হিটলারের শিবিরে ম্যানস্টাইনের তলব হল।

প্ল্যানটা হিটলারকে বুঝিয়ে বলেন ম্যানস্টাইন।

বলেন, আক্রমণের জোরটা দিতে হবে শত্রুর মধ্যিখান দিয়ে। অর্থাৎ আমাদের আর্দেনস পার হতে হবে।

একটু ইতস্তত করে হিটলার প্রশ্ন করেন, কিন্তু কী দিয়ে আক্রমণ চালাবে। পাহাড়ের গায়ে ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া বাহিনী অচল।

দৃঢ় কণ্ঠে ম্যানস্টাইন জবাব দেন, না অসম্ভব নয়। উপযুক্ত জেনারেলের হাতে আক্রমণের ভার পড়লে এ আক্রমণ সফল হবে।

ম্যানস্টাইনের কথাটা ভেবে দেখলেন হিটলার। ঠিকই বলেছে ম্যানস্টাইন —আক্রমণ যদি করতে হয় তবে ম্যাজিনো লাইনের চাইতে আর্দেনসের পর্বতমালা দিয়ে আক্রমণ করা অনেক বুদ্ধিমানের কাজ হবে। শ্লিফেন প্ল্যানের চাইতে ম্যানস্টাইনের প্ল্যান অনেক ভালো।

কিন্তু আর্দেনস দিয়ে আক্রমণ করা সহজ কথা নয়। কারণ উপযুক্ত কম্যাণ্ডার না পেলে এ আক্রমণ ব্যর্থ হবে।

এ আক্রমণের দায়িত্ব কাকে দেয়া যায়? হিটলার ভাবেন। অবশেষে তলব হল পানজার আর্মির স্রষ্টিকর্তা জেনারেল ফন গুডেরিয়ানের।

* * *

হিটলারকে ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা বিচলিত করলে। একদিন

কতোগুলো গোপন কাগজপত্র নিয়ে এক জার্মান বৈমানিক 'বনে' যাচ্ছিলেন। পথের মাঝে হঠাৎ তার প্লেন খারাপ হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে তাঁকে বেলজিয়ামে নামতে হল। তাঁর গোপনীয় কাগজে ছিল জার্মান আক্রমণের বিশদ বিবরণী। বৈমানিক চেষ্টা করলে তার কাগজ পুড়িয়ে ফেলতে। কিন্তু কাজে সফল হল না। কিছু কাগজ বেলজিয়াম সরকারের হাতে পড়ল।

হিটলার ভেবেচিন্তে দেখলেন, আর দেরি নয়। এবার দেরি করলে ভবিষ্যতে অনুতাপ করতে হবে। আক্রমণ আরম্ভ করতে হবে।

অতএব ম্যানস্টাইনের প্ল্যান গুডেরিয়ানকে বুঝিয়ে দিয়ে হুকুম দিলেন, আক্রমণ শুরু করো।

* * *

ম্যানস্টাইনের প্ল্যান কিন্তু জার্মান হাই কম্যাণ্ডের মনঃপূত নয়। এ প্ল্যানে তাদের একটু বিশ্বাস নেই।

কিন্তু উপায় নেই। হিটলারের আদেশ মানতেই হবে। আক্রমণের পুরোভাগে আছেন ফন গুডেরিয়ান, ম্যানস্টাইনের বন্ধু। তাঁর কর্তা ফন ক্লাইস্ট।

বিদ্রূপ করে ক্লাইস্ট গুডেরিয়ানকে বলেন, নাও, এ লড়াই হল এক বছরের ধাক্কা।

হেসে গুডেরিয়ান জবাব দেন, না, দুমাসের।

আক্রমণ শুরু হল। কালবৈশাখী ঝড়ের মতো আর্দেনস পর্বতমালা ভেদ করে গুডেরিয়ান ডানকার্কের বারো মাইল দূরে এসে ছাউনি গাড়লেন। এমনি সময় এই আক্রমণের প্রধান সেনাপতি ফন রুনস্টাড টেলিফোন করে গুডেরিয়ানকে বললেন আর অগ্রসর নয়। এবার একটু জিরিয়ে নাও।

যে আক্রমণ সফল হতে ক্লাইস্ট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এক বছর, গুডেরিয়ান আশা করেছিলেন দুমাস, পানজার আর্মি মাত্র আঠারো দিনে এই লড়াই শেষ করলে।

জার্মান সৈন্যবাহিনীর গতি দেখে জগৎ স্তম্ভিত—হিটলার হতবাক।

ইতিমধ্যে গুডেরিয়ান ভাবছেন কবে আবার অগ্রসর হবার হুকুম মিলবে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন ইংরেজ সৈন্যবাহিনী জাহাজে করে দেশে ফিরে যাচ্ছে। ইচ্ছে করলেই তিনি এদের পিঁপড়ের মতো পিষে মেরে ফেলতে পারেন। কিন্তু করবার জো নেই।

ইংরাজদের নিয়ে কী করবেন হিটলার তাঁর মন ঠিক করে উঠতে পারেন নি। তিনি চান ফরাসীদের সম্পূর্ণ পরাজয়—আর ইংরেজের? ভাবেন এদের ধ্বংস করতে কতোক্ষণ। বোমা দিয়ে এদের তিনি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারেন যে কোন মুহূর্তে। তাই এ যাত্রায় তিনি ইংরেজ সৈন্যদের রেহাই দিলেন।

দুদিন বাদে হিটলার হুকুম দিলেন গুডেরিয়ানকে, ডানকার্ক দখল করো।

ইতিমধ্যে শেষ ইংরেজ সৈন্য অবধি জাহাজে উঠে ডোভারের পানে রওনা দিয়েছে।

সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে হিটলার ইংরেজ জাতিকে রেহাই দিয়েছেন। অলক্ষে বিধাতা হয়তো হিটলারের নির্বুদ্ধিতা দেখে হাসলেন।

তার কারণ চার বছর বাদে ইংরেজ এই অপমানের প্রতিশোধ নিলে।

*   *   *

চার

ফন গুন্ডেরিয়ানের সৈন্যবাহিনী যখন আর্দেনস পর্বতমালা ভেদ করে চ্যানেলের পানে এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা চারজনা ভিন্ন পথ দিয়ে চ্যানেলের দিকে যাচ্ছি। শুধু আমরা চারজনা নই—অসংখ্য, হয়তো সহস্র হবে, আমাদের মতো নিরাপদের সন্ধানে এগিয়ে চলেছে।

এ যেন মহাকালের যাত্রা।

ক্লান্তি নেই, কষ্ট নেই, সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ করে আমরা এগিয়ে যাই। দূর দিগন্তব্যাপী যতোদূর দৃষ্টি যায় শুধু দেখতে পাই মানুষ আর মানুষ। আজ পেছনে তাকাবার সময় নেই। অনুতাপ, আক্ষেপ, কী হারিয়েছে হিসেবনিকেশ করবার ফুরসত নেই। এ হচ্ছে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, বাঁচবার সংগ্রাম। আজ সবাইকে এগোতে হবে।

হাঁটতে হাঁটতে তেষ্টা পায়।

এবার চিন্তা হয় কোথায় জল পাই। চারিদিকে সবুজ বনানী, ফুলে ও ফলে ভরা, কিন্তু তবু জলের তৃষ্ণায় সমস্ত এলাকা যেন মরুভূমি বলে মনে হয়। কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটা লোকালয়ে এলাম। জলের সন্ধান করতে দেখি যে পয়সা দিয়ে সবাই জল কিনছে। প্রতি বোতলের দাম পাঁচ ফ্রাঙ্ক।

মনে মনে বললাম : হায়রে বিধাতা, একেই বলে মানুষে-মানুষে সংগ্রাম। নইলে পয়সা দিয়ে খাবার জল কিনতে হয়।

আমাদের দুর্গতি দেখে সেই গ্রামের এক বুড়ো ভদ্রলোকের দয়া হল। তিনি আমাদের তাঁর ফলের বাগানে নিয়ে এলেন। আমাদের হাতে ফল দিয়ে বললেন : নিয়ে নাও। যতো পার। নইলে সবই জার্মান ব্যাটাদের পেটে যাবে।

জল চাইতে ফল—এ শুধু ছেলেবেলায় গল্পে পড়েছি। আজ বাস্তবে এ

ঘটতে দেখে প্রথমটায় কিছু বিস্ময় হয়েছিল কিন্তু [illegible] পরিস্থিতি দেখে মনে হল এ সময়ে কিছুই অসম্ভব নয়।

* * *

একমনে আমরা এতোদিন শুধু হেঁটেছি, শত্রুর ভাবনা করি নি। ভেবেছি প্যারী যখন ত্যাগ করে এসেছি তখন বিপদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি। দেশের অন্যদিকে কী ঘটেছে তার খবর রাখি নি। তাই দুর্ভাবনা ছিল কম—একটানা হাঁটার শক্তি পেয়েছি।

কিন্তু একদিন বিপদ ঘনিয়ে এল।

আমরা তখন গোমেজ বলে একটা গ্রামের কাছে। এমনি সময় নীল আকাশে একঝাঁক শত্রুর বিমান দেখা দিল। প্রথমটায় কোন খেয়াল হয় নি। শুধু দূর থেকে মৌমাছির গুঞ্জনের মতো শব্দ শুনতে পেয়েছি। ক্রমেই সে শব্দ তীব্র হতে লাগল। যাত্রীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। আশ্রয়ের সন্ধানে সবাই চারদিকে দৌড়তে লাগল।

আমরাও তাড়াতাড়ি মাটির উপর শুয়ে পড়লাম। বোমার হাত থেকে রেহাই পাবার সেই ছিল উৎকৃষ্ট পথ।

জানিনে কেন সে যাত্রা শত্রুর বিমান বাহিনী আমাদের নিষ্কৃতি দিলে। ভোমরার মতো গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। না ফেলল বোমা, না হল গুলিবৃষ্টি।

* * *

প্রাণের ভয়ে মানুষ যখন ছোটে তখন কোন দুঃখ-কষ্টই তার মনে ক্লান্তি আনে না। এই কয়েকদিনের যাত্রায় আমরাও নিস্তেজ হই নি। একটানা এগিয়ে চলেছি।

আজ পুরানো সেই দিনগুলোর কথা মনে হলে বিস্মিত না হয়ে পারি নে। ভাবি কী করে এই দুঃখ-কষ্টকে তুচ্ছ, অবহেলা করতে পেরেছি—কিসের প্রেরণায় সেদিন এগিয়ে গিয়েছিলাম।

আমার চারদিকে যখন অগণিত জনসমুদ্রকে হাঁটতে দেখেছি তখন ভেবেছি

যে আমি বিদেশী। এদেশের জলমাটির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তবু আজ আমি এদের বেদনার অংশীদার। সেই অন্তরের অনুভূতিই হয়তো আমার মনে এগিয়ে যাবার প্রেরণা দিয়েছে।

* * *

হাটি আর জিরিয়ে নিই।

একদিন ক্রেস্‌নে গ্রামের কাছে এসে একদল সৈন্যর সঙ্গে দেখা। দূর থেকে তাদের দেখে প্রথমটায় জার্মান সৈন্য বলে ভয় হয়েছিল। কিন্তু তারা সামনে আসতে ভয় দূর হল।

এরা হল বেলজিয়ান সৈন্য।

যুদ্ধের খবরাখবর এদের কাছ থেকে পেলাম। সে খবর অতি নৈরাশ্যজনক।

একজন বললে: কাল রাত্রে প্যারীর পতন হয়েছে। জার্মান বাহিনী এসে শহরের বুকে আস্তানা গেড়েছে।

খবরটা শুনে আমি স্তম্ভিত হলাম।

মারী কেঁদে ফেলল।

ফ্রাঁসোয়া ও তার প্রেয়সী হতবাক্।

বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না প্যারীর পতন হয়েছে। আমি ভাবতে থাকি, এই সেই শহর, যেখানে একদিন প্রতি ঘরে ঘরে, প্রতি রাস্তায় রাস্তায় স্বাধীনতার ধ্বনি উঠেছিল। আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের সেই ইতিহাস—তার রূপক কাহিনী। আমার কানে বেজে ওঠে একতা, স্বাধীনতা, সাম্যের ধ্বনি—যে ধ্বনি এনেছিল ফরাসী বিপ্লব। ভাবি কোথায় গেল সেই জ্যাকোবিন ক্লাব, যারা অতীতের বিপ্লবে নাগরিককে উত্তেজিত করেছিল। কোথায় সেই রবস্‌পিয়ের, দাঁতো, নেতৃবৃন্দের দল—যাদের জ্বালাময়ী বক্তৃতা এনেছিল বিদ্রোহের তুফান।

হায়রে, প্যারী, আজ বিলীন হয়েছে তার অতীতের গৌরব। স্তব্ধ হয়েছে তার জনতা, যার হুংকারে একদিন সমস্ত জগৎ কেঁপে উঠেছিল। তাই আজ সে অসহায় শিশুর মতো বিনা বাধায় শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

বেলজিয়ান সৈন্যদল ছিল আমাদের মতোই পলাতক। অর্থাৎ নিরাপত্তার সন্ধানে তারাও যাত্রা করেছে। তাই আমাদের প্যারী পতনের সংবাদ জানিয়ে চলে গেল অন্যদিকে। আমরাও হতাশ হয়ে ঘুরতে ঘুরতে সাঁতলিও বলে একটা গাঁয়ের কাছে এলাম। গাঁয়ের পাশ দিয়ে চলে গেছে লোয়ার নদী। একবার সেই নদী পার হতে পারলে অনেকটা নিশ্চিন্দি হওয়া যায়।

*   *   *

ম্যান প্রপোজেজ, গড ডিসপোজেজ।

এ হল সংসারের অতি পুরাতন নীতি। আমরা যখন লোয়ার নদী পার হয়ে নিরাপত্তার স্বপ্নে মশগুল, তখন হঠাৎ শুনতে পেলাম কামানের গর্জন। সেই গর্জন ভেঙে দিল আমাদের রঙীন স্বপ্ন।

ফ্রাঙ্কোয়া, মারী-মনিকা, আমরা সবাই হতবাক। বিপদ যে এতো নিকটে ঘনিয়ে এসেছে এ কখনও কল্পনা করি নি।

একটু বাদেই ভেসে এল সৈন্যবাহিনীর কুইকমার্চের শব্দ। ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে দেখি একদল ফরাসীবাহিনী। তাদের পদধ্বনিতে গ্রাম মুখর হয়ে তুলেছে।

যাত্রীদের মধ্যে এক গুঞ্জন উঠল। শুনতে পেলাম যে জার্মান বাহিনী সন্নিকটে। বলতে গেলে গ্রামের দুয়ারে।

ভাবনায় পড়ি। কি করব—টু বী অব নট টু বী। অর্থাৎ এ গ্রাম থেকে পালাব, না বীরত্বের পরিচয় দেব। সম্মুখে শত্রুবাহিনী, পেছনে এক নিরালা বাগানবাড়ি। ফ্রাঙ্কোয়া বলে: চলো, এখনকার মতো ঐ বাগানবাড়িতে আশ্রয় নেয়া যাক।

বৃথা চিন্তা করে সময় নষ্ট করলাম না। দেয়াল টপকে সেই নির্জন বাগান-বাড়িতে ঠাঁই নিলাম। কাজটা সহজসাধ্য নয়। দেয়াল পার হতে রীতি-মতো বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু প্রাণের মায়ার কাছে বিপদ কিছুই নয়।

ফ্রাঁসোয়া, মারী ও মনিকার চাইতে ভয়টা আমারই বেশী। তার কারণ আমি সাংবাদিক। মানুষ ও দেশের শাসনতন্ত্রকে গালমন্দ দেওয়া আমার পেশা। জার্মান নাৎসীবাহিনীকে আমার লেখনী থেকে নিষ্কৃতি দিই নি, তাই মনে মনে আতঙ্ক হয় আমার, মসীর প্রতিশোধ হয়তো এরা অসি দিয়ে নেবে। অতএব ভাবি, আমার মৃত্যু অবধারিত।

পৈতে হল বামুনদের নিদর্শন। সাংবাদিকের পরিচয় হল তার ক্রেডেনশিয়াল কার্ডে। আর সেই পরিচয়পত্রে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা ছিল আমি জাতে ভারতীয়, আইনে ইংরেজের অধীনে। অতএব অপরাধীর কাঠগড়ায় বসিয়ে দোষী সাব্যস্ত করতে কাউকে একটু বেগ পেতে হবে না।

আমার মনের কথা যেন ফ্রাঁসোয়া বুঝতে পারে। বলে, ভাই মুখুজ্যে, তোমার ক্রেডেনশিয়াল কার্ডে আছে বিপদের গন্ধ। সময় থাকতে ওটাকে পুড়িয়ে ফেলো।

আমি জিজ্ঞেস করি : তার মানে ?

মানে ঐ কার্ডখানা হল সব নষ্টের মূল। অর্থাৎ ওখানাকে যদি বিসর্জন দাও তবে কেউ জানতে পারবে না যে তুমি হলে একজন ভেরী ইন্টারেস্টিং পার্সন। যেখানে ইন্টারেস্ট সেখানেই বিপদের গন্ধ। কাজেই তোমার জাতচিহ্নকে দাও বিসর্জন। বলেই ফ্রাঁসোয়া দেশলাই জ্বালালে।

আমি বিনা প্রতিবাদে কার্ডখানাকে আগুনে দিলাম। অর্থাৎ আমি জাতচ্যুত হলাম।

* * *

আশা ও উৎকণ্ঠায় আমি প্রহর গুনছি। হঠাৎ দূর থেকে কার যেন পদধ্বনি ভেসে এল। ভয়ে ভয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম শত্রুবাহিনীর অভ্যর্থনায়। দেখতে পেলাম দেয়াল টপকে একটি সৈনিক বাগানবাড়িতে নামছে।

মনের আতঙ্ক বাড়ে। সৈন্যটি আমাদের দেখে বিস্মিত। হয়তো ভেবেছিল বাগানবাড়ি পাবে নিরালা নির্জন। আমাদের দেখা পাবে আশা করে নি। আমরাও একটু এগিয়ে যাই। সৈন্যটি ফরাসী, কাজেই আমাদের দুশ্চিন্তা কিছুটা

করে। একটু বাদে তার আরো তিনজন সঙ্গী এসে উপস্থিত। সবাই তাদের দলকে, হারিয়েছে। ইউনিটের সন্ধানেই তারা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কোথায় তাদের 'ইউনিট', কে জানে।

প্রথম সৈন্যটি লিউটেনান্ট। আমার পানে তাকিয়ে বলল : সিগারেট দিতে পার।

সিগারেট বের করে দিই।

ধন্যবাদ। আজ তিনদিন হল একটা সিগারেট খাই নি। কী দুর্যোগের ভেতর দিয়ে যে সময় কাটিয়েছি কী বলব।

চেহারা দেখে মনে হল যে কথাটা বিশেষ অতিরঞ্জিত নয়। চোখ বসে গেছে, মুখ পাণ্ডুর, হাঁটবার শক্তিও তাদের নেই।

* * *

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর সৈন্যদের একজন প্রস্তাব করলে, চলো বড়ো রাস্তার সামনে। এখানে থেকে বিশেষ সুবিধে হচ্ছে না।

সামনে ছিল একটা বড়ো গাছ। একজন উঠে গেল গাছের উপর। সেখান থেকে বাইনকুলার দিয়ে দেখতে লাগল রাস্তা। একটু বাদে চীৎকার দিয়ে বললে, ব্রাভো, দেখতে পেয়েছি আমাদের ইউনিটের ব্রাদারদের। বিরাট লরি করে সবাই এদিকে আসছে। এবার আর ভাবনা কিসের। এগোনো যাক।

বন্ধুদের জন্য প্রতীক্ষা না করে সৈন্যটি বীরদর্পে এগিয়ে গেল। আমরা দূর থেকে তাকে দেখতে লাগলাম। বেশীদূর তাকে এগোতে হল না।

হঠাৎ জার্মান কণ্ঠস্বর ভেসে এল : হল্ট।

দেখতে পেলাম সৈন্যটির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে লরি-বোঝাই জার্মান সৈন্য।

নিরুপায় হয়ে ফরাসী সৈন্যটি হাত তুলে দিল।

সমস্ত দৃশ্য দেখে মনে হল, এতটা পথ সে কেন শুধু হেঁটে গেছে শুধু আত্ম-সমর্পণ করার জন্যে।

এবার আমাদের সতর্ক হবার পালা।

লিউটেনান্ট বলে, সাবধান, চারদিকেই শত্রু। লুকিয়ে থাকো।

রাতটা কাটল উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে। কখন কী ঘটে জানি নে।

ভোর হবার আগেই আমরা যাত্রা শুরু করি। শত্রুর নজরকে এড়িয়ে যেতে হবে। গমখেত আর জলার ভেতর দিয়ে হাঁটা সহজ কথা নয়।

একটু এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলাম এক টেলিগ্রাফ তার। ফিসফিস করে ফ্রান্সোয়া বলে, শত্রুর টেলিগ্রাফ লাইন কাটব নাকি?

তার কাটতে প্রথমটায় একটু দ্বিধা হল। যদি বিপদে পড়ি। কিন্তু তারপরেই ভাবি, শত্রুকে বাধা দিতে কিসের ভয়।

দেরি না করে পটাপট তার কেটে দিলাম।

* * *

এই বীরত্বের পুরস্কার মিলল পরদিন।

রাতটা গমখেতেই কাটিয়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠে দেখি আমাদের চারদিকেই সৈন্যবাহিনী। ভয়ে বুক কাঁপতে লাগল।

ফ্রান্সোয়া বলে, মুখুজ্যে, কালকের তারকাটার পরিণাম। অপরাধীকে ধরতে এসেছে।

আমি চোখ বুঁজে ভাবতে লাগলাম গুপ্তচরদের পরিণাম। চোখে রুমাল বেঁধে দাঁড় করিয়ে গুলি। বিশ্বসংসারে কেউ এই মৃত্যুর কথা জানতে পারবে না। ভাবি, আমাদের ভাগ্যেও কি তাই আছে।

জার্মানদের নজর এড়াবার জন্যে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে লুকোলাম। সেখানে বসে তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নেওয়া গেল। তারপর করলাম এক অসমসাহসের কাজ। মুখ মুছে ভিজে বেড়ালটির মতো সোজা গিয়ে জার্মানদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর জার্মান ভাষায় বললাম গুতেন মর্গান। ভী গেহত্ এস ইনেন—অর্থাৎ কেমন আছ?

জবাব এল, গুতেন মর্গান। আবার ভাস মাখেন জী ইয়ের—অর্থাৎ এ এলাকায় কী করছ।

যেন কিছুই জানি নে, এমনি একটা ভাব নিয়ে জবাব দিই, ভবঘুরে, পথের সন্ধানে ঘুরছি। আচ্ছা, সামনের এ রাস্তাটা দিয়ে যেতে পারি কি?

দুজন জার্মান প্রায় একসঙ্গে জবাব দেয়—আলবত্ত। নিশ্চয়।

আমরা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করি।

এমনি সময় আর একটি জার্মান এগিয়ে এসে বলে, কোথায় যাবে হে? তোমরা কি রিফিউজী?

আমরা জবাব দেবার আগেই জার্মানটি বলে, বেকার ঘুরছ। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। লড়াই শেষ হয়ে গেছে। ফ্রান্স আত্মসমর্পণ করেছে।

লড়াই শেষ হয়ে গেছে। বিশ্বাস হয় না। আত্মসমর্পণ করেছে ফ্রান্স!

*　　*　　*

যে কথা আমি অসম্ভব মনে করেছিলাম হিটলার কিন্তু অল্পদিনেই তা সম্ভ করেছিলেন।

ডানকার্কের পতনের পর তীব্র গতিতে জার্মান বাহিনী ফ্রান্সের দক্ষিণ প্রা দিয়ে বেড়িয়ে গেল। বৃদ্ধ ফরাসী সেনাপতি জেনারেল ওয়েগাঁ জার্মানদে প্রতিরোধ করার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। তাসের ঘরের মতো ফরাসী প্রতিরো ভেঙে পড়ল। জেনারেল দ্য গল বললেন, সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে—ফ্রা থেকে না হোক, দক্ষিণ আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশ থেকে। কিন্তু দে বিভীষণ বাহিনীর শেষ নেই। তারা দ্য-গলকে বাধা দিল। সন্ধির আয়োজ শুরু হল

*　　*　　*

ফ্রান্সের কম্পিয়েন এলাকার কাছে একটি ছোট বন আছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। সেই বনের ভেতর আছে একটি ছোট পাথর। এর ভেতর লেখা আছে, 'এইখানে এক স্বাধীন জাতির কাছে জার্মানদের গর্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছে—তারিখ ১১ই নভেম্বর ১৯১৮।'

দীর্ঘ বাইশ বছর আগের কথা। হিটলার এই পাথরের খোদাই-করা

অক্ষর কয়েকটি ভুলতে পারেন নি। প্রতিদিন ভেবেছেন, কী করে এই অপমানের প্রতিশোধ নেবেন। আজ বিধাতা সুযোগ দিয়েছেন।

১৯৪০ জুন মাসের অপরাহ্ণ। সদলবলে হিটলার কম্পিয়েনের বনে এলেন—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে নয়, অপমানের প্রতিশোধ নিতে। যেমনি ভাবে ১১ই নভেম্বর তারিখে ঘটনা ঘটেছিল আজ তিনি তার পুনরাবৃত্তি করবেন। পাথরের গায়ে এবার তিনি জার্মান ভাষা খোদাই করবেন। যে ট্রেন-গাড়িতে বসে অতীতে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হয়েছিল হিটলারের আদেশে সেই গাড়ি আজ আজ আবার আনা হয়েছে। এই গাড়িতে এসে আজ তিনি ফরাসীদের সঙ্গে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করবেন।

একটু বাদে ফরাসী সরকারের প্রতিনিধিরা এলেন। দু-চারটে মামুলি কথা হল। এবার সন্ধির শর্ত পড়া শুরু হল। হিটলারের দাবি কিছু নয়, অর্থাৎ ফ্রান্সের এক-তৃতীয়াংশ থাকবে স্বাধীন, বাকীটা থাকবে তাঁর অধীনে। বর্তমানের জন্যে তিনি অবশ্যি ফরাসী নৌবাহিনীকে ব্যবহার করতে চান না।

সন্ধির শর্ত শুনতে শুনতে ফরাসী প্রতিনিধিদের চোখে জল এল।

বাইশ বছর আগে ভের্সাইর সন্ধির শর্ত শুনে জার্মান প্রতিনিধিরা এমনি কেঁদেছিলেন।

প্রথম কয়েক পাতা পড়া হবার পর হিটলার সগর্বে ট্রেনের কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন। অপমানের প্রতিশোধ তিনি অক্ষরে অক্ষরে নিয়েছেন। জার্মান জাতিকে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তিনি পূরণ করেছেন।

বাইরে ছিল মিলিটারি ব্যাণ্ড পার্টি। আজকের জন্যে তাদের ডাকা হয়েছে। হিটলারকে দেখে তারা বাজাতে শুরু করল—'ডয়েচল্যাণ্ড উইবার আলেস'—অর্থাৎ সকল দেশের সেরা জার্মানি।

নীরব হয়েছে 'লা মের্সাই' সঙ্গীত। স্বাধীন রাজ্যের ইতিহাস থেকে ফ্রান্সের নাম মুছে গেছে। শুধু সাগরপার থেকে ভেসে আসছে ইংরেজ জাতির কণ্ঠস্বর—গড সেভ দি কিং।

লড়াই চালাবার জন্যে তারা বদ্ধপরিকর।

লড়াই শেষ, কিন্তু আমাদের সমস্যার শেষ নেই। আমাদের ভাবনা, এবার কোথায় যাই। প্যারী না অরলিঁও।

ভবঘুরের মতো এ গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘুরি। গ্রামগুলো প্রায়ই জনমানবহীন। দোকানপাট বন্ধ কিংবা লুটতরাজ হয়ে গেছে। গ্রামবাসীরা বলাবলি করে, এ বিশৃঙ্খলার জন্যে প্যারীর রিফিউজীরাই দায়ী। তারাই এ লুটতরাজ করেছে। আমরাও প্যারীর বাসিন্দা। কাজেই এ কথা শুনে আমাদের মনে ভয় হয়।

একদিন নিজের চোখের সামনেই লুটতরাজ দেখতে পেলাম। ব্যাপারটা আর কিছু নয়। উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে আমরা যখন ঘুরছি তখন একটা লোক এসে বলল, বঁজুর মঁশিও। আশ্রয় চাও তবে এসো আমার সঙ্গে।

লোকটা আমাদের এক দিব্যি সাজানো গোছানো বাড়িতে নিয়ে গেল। বাড়ি দেখে মন খুশী। রান্নার শোবার আয়োজনে ত্রুটি নেই। ভাবলাম, যাক এ কয়েকদিন অনিদ্রার পর এবার ভালো করে ঘুমুনো যাবে। আর খাবার চিন্তা —ওটা মেয়েদের হাতে ছেড়ে দিলাম। রান্নার আয়োজন ওরাই করতে লাগল।

আমরা যখন বাক্সপ্যাটরা গোছাতে ব্যস্ত তখন দেখি যে লোকটা আমাদের ডেকে এনেছিল সে বাড়ির আলমারি ভাঙতে শুরু করেছে। তারপর আলমারি থেকে দামী দামী জিনিসপত্র তার বাক্সে ভরতে লাগল। আমরা আপত্তি করি কিন্তু লোকটা নিরুত্তর। আপন মনে আলমারি থেকে জিনিস খোলে আর নিজেব স্যুটকেসে ভরে। লোকটার অভিসন্ধি বুঝতে কোনো অসুবিধে হল না।

দামী জিনিসপত্র নিয়ে লোকটা এবার গটগট করে আমাদের চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমরা স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

* * *

ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাওয়াই শ্রেয়। অর্থাৎ আবার প্যারীর পানে আমাদের রওনা দিতে হবে।

কিন্তু আমরা তখন ক্লান্ত। পা আর চলতে চায় না; মন আরো দুর্বল। হেঁটে ফেরা অসম্ভব। ফিরে যাবার আর কোন বন্দোবস্ত নেই। ভাবনায় পড়ি : কী করা যায়।

অতএব আর কয়েকটা দিন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরি। ঘুরতে ঘুরতে এঁটোপ বলে একটা গ্রামে এলাম। সেখানে এসে শুনতে পেলাম প্যারী যাবার ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে।

এক বড়ো দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেলাম। ট্রেনের কথা শুনে আর দেরি করি নি। সবাই মিলে গেলাম স্টেশনে। গিয়ে দেখি এক বিরাট জনসমুদ্র ট্রেনের প্রতীক্ষা করছে। এই জনতার ব্যূহ ভেদ করে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢোকাই দায়।

ট্রেনের গাড়ি দেখে মনটা মুষড়ে গেল। মালগাড়ি, তার ভেতর বসে আছে যাত্রীর দল—যেন গাড়িবোঝাই গোরুর দল।

রুচি আর বিচার দুই তখন জলাঞ্জলি দিয়েছি। তাই ভগবানের নাম স্মরণ করে গাড়িতে গিয়ে বসলাম।

এবার ট্রেন ছাড়ার পালা।

সে আর এক বিভ্রাট।

অর্থাৎ গাড়ি আছে কিন্তু কচুয়ান নেই। তাই বসে বসে সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর স্বপ্ন দেখি আর ভাবি কখন গাড়ি ছাড়বে।

তখন প্রায় বেশ রাত্রি। আকাশ স্বচ্ছ পরিষ্কার, অসংখ্য তারায় ভর্তি। কিন্তু তখন কাব্য করার মতো প্রবৃত্তি আমাদের নেই।

চিন্তা করতে করতে তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। হঠাৎ গাড়ির ঝাঁকুনিতে সেই তন্দ্রা ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি গাড়ি চলতে শুরু করেছে।

তখন ভোর প্রায় চারটে

*   *   *

শৈশবে যখন মালদর গাড়ি শেয়ালদহ স্টেশনে হুসহুস করে ঢুকত তখন ভারী বিস্ময় লাগত। সেই বিস্ময়ের কারণ ছিল কলকাতা

শহর। এই আজবপুরী বার বার দেখেও আমার কৌতূহল কোনোদিন মেটে নি।

আজ প্রভাতে বহুদূর থেকে যখন প্যারীর স্টেশনের সিগন্যাল নজরে পড়ল আমার মনে সেই অতীতের বিস্মরণ জেগে উঠল। কল্পনার জাল বুনেছিলাম যে লড়াইতে প্যারী ধ্বংস হয়ে গেছে। ধূলায় মিশে গেছে আইফেল তুরের স্তম্ভ। বিশৃঙ্খল নাগরিক জীবন—এই ছিল আমার কল্পনার বস্তু। অতএব প্যারী স্টেশনে নেমে আবার যখন শুনতে পেলাম কাগজ-হরকরার চীৎকার, জনতার কলরব, তখন বিস্মিত না হয়ে পারি নি।

দেখতে পেলাম অতীতের মতো স্টেশন সরগরম হয়ে আছে। বেচা-কেনা ব্যবসা-বাণিজ্য চলছে গতানুগতিক ভাবে। নাগরিকদের এই জীবনযাত্রা দেখে বিশ্বাস হয় নি যে প্যারীর শাসনকর্তা নাৎসী বাহিনী।

শহরে এসে ব্যাপারটা পুরোপুরি জানতে পারলাম। প্যারীতে কায়েমী হয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে জার্মান বাহিনী জনসাধারণকে তাদের আচার-ব্যবহারে মুগ্ধ করার চেষ্টা করেছে। অতি শিষ্ট ভদ্র ব্যবহার, কথায় রূঢ়তা নেই, ট্রামে বাসে, রেস্তুরাস্তে সর্বত্রই অমায়িক ব্যবহার।

অতি অল্পদিনের মধ্যে জার্মান বাহিনীর এই মিষ্টি ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ হল।

পাঁচ

স্টেশনের বাইরে এসে আর এক বিস্ময় চোখে পড়ল। একটানা জনস্রোত ছুটে চলেছে শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি। উত্তেজিত বা উৎকণ্ঠিত কেউ নয়। রাস্তার দুপাশের কাফেগুলো সরগরম—ফুটপাথের উপর মদের গ্লাস নিয়ে সবাই গল্পে মশগুল। আমি ভাবলাম প্যারীর নাগরিক স্বাধীনতা হারিয়েছে সত্য কিন্তু শান্তি হারায় নি।

খবরের কাগজের হকারের চীৎকার শুনতে পেলাম। 'ল্য গেয়ার দ্য ফ্রান্স, সে ফিনি, গেয়ার দ্য আংগলেতেয়ার কমান্স' (ফ্রান্সের লড়াই শেষ, ইংল্যাণ্ডের লড়াই শুরু হয়েছে)। হকারের কণ্ঠস্বরে ছিল উত্তেজনার ঢেউ—ক্রেতাকে আকর্ষণ করার চাতুর্য। নাগরিক জীবন দেখে মনে হল না যে প্যারীর জীবনে কোনো পরিবর্তন হয়েছে।

* * *

এবার একটু পুরানো কথা বলা দরকার।

হিটলার যখন ক্ষমতা পেলেন তখন ফরাসী সমাজে, বিশেষ করে, ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়ের ভেতর এক উত্তেজনার ঢেউ বয়ে গেল। এই উত্তেজনার নীচে ছিল আর এক স্তর—যারা মনে মনে শুধু হিটলারের সাফল্য কামনা করেছে। কারণ তাদের মনে মনে ছিল কম্যুনিজমের আতঙ্ক। তাদের ধারণা যে এই বিভীষিকার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে শিখণ্ডীর প্রয়োজন। অতএব জার্মান নাৎসী বাহিনী হবে এই শিখণ্ডী।

দেশের মধ্যে যারা বামপন্থী, তারাও হিটলারকে সমর্থন করলে। তার কারণ জার্মান-রুশ-চুক্তি। সবারই ধারণা, হিটলার প্রগতিশীল—নইলে কি আর রাশিয়ার সঙ্গে মিতালি করে? কিন্তু প্রকাশ্যে, জনসাধারণের কাছে দু দলেই জার্মানদের বর্বর বলে গালিগালাজ করে।

দেশের 'বুর্জোয়া' সম্প্রদায়ও ছিলেন এই লড়াইয়ের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে সৈন্যবাহিনীর কর্তারা। এর প্রমাণ একদিন আমি পেয়েছিলাম এক ডিনার টেবিলে।

প্রধান সেনাপতির তখন ডান হাত জেনারেল জর্জ। লড়াই শুরু হবার আগে এক ডিনার টেবিলে বসে তাঁর স্ত্রী আক্ষেপ করে বলছিলেন : পোল্যাণ্ডের জন্যে লড়াই করাটা সত্যিই দুঃখের বিষয়।

অতএব প্যারীর পতনের পর দেশের সবাই পরাজয়ের গ্লানিকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করলে। লড়াইয়ের শেষে জার্মান বাহিনী যখন সন্ধিপত্র নিয়ে এল—সবাই তখন একবাক্যে বলতে লাগল, জার্মান বর্বরতা হল শুধু কাল্পনিক কাহিনী।

ছয়

অতি অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আবার দেশের মধ্যে পুরানো জীবন ফিরে এল। হৈ-হুল্লোড়, আনন্দ। রাজধানী আবার সরগরম হয়ে উঠল।

দেশ তখন দু ভাগে বিভক্ত। বৃদ্ধ জেনারেল পেঁতা তাঁর দলবল নিয়ে ভিসীতে বসে আছেন, আর প্যারীর বুকে বসে আছে জার্মান বাহিনী।

একদিন রেডিওতে জেনারেল পেঁতার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। দেশবাসীকে আশ্বাস দিচ্ছেন তিনি। ভয়-ভাবনার কিছু নেই।

দেশবাসীরও ধারণা, লড়াইয়ের হাঙ্গামা শিগগিরই মিটে যাবে। জার্মান বাহিনীর সঙ্গে একা ইংরেজের লড়াই করা অসম্ভব।

* * *

কিন্তু আমার ভাগ্যে লেখা ছিল দুর্গতি।

আমি ইংরেজের প্রজা, জার্মানদের শত্রু। ফ্রান্স আত্মসমর্পণের পর আমার জাত গিয়েছে অর্থাৎ আমি একঘরে হয়েছি। বন্ধু নেই, আত্মীয় নেই যার সঙ্গে বসে দুদণ্ড কথা বলতে পারি। পরিচিতরা প্রকাশ্যে আমাকে এড়িয়ে চলেন। বাড়ির তদারক কনসিয়ার্জি সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায়।

প্যারীতে ফিরে আসার কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে আমাকে শিগগিরই রাজ-অতিথি হতে হবে। অর্থাৎ বন্দী হতে হবে। এখন শুধু ভাবনা, এ দিনটা কবে আসবে।

বাড়ির খাঁচায় বন্ধ হয়ে থাকার অভ্যেস আমার নেই। বিশেষ করে গ্রীষ্মের রৌদ্রপ্রখর দিনে বাড়ির আশ্রয়ের চাইতে গাছের আশ্রয় আমার কাছে অনেক আরামদায়ক। কিন্তু সব ভেবেচিন্তে দেখলাম যদিও সাহস দেখানো বীর-পুরুষের কাজ, মাঝে-মাঝে কাপুরুষের পরিচয় দিলে জীবন রক্ষা পায়। তাই লোকালয় এড়িয়ে নির্জনে ঘুরতে লাগলাম।

দিন ঘুরে এল ১৪ই জুলাই—'ব্যাস্টিল ডে'—দেশের স্বাধীনতা দিবস। আমার মনে পড়ল এক বছর আগে এই দিনটার কথা। স্যাঁ জেলেসি ভেদ করে আমি গিয়েছিলাম অপেরা হাউসের কাছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছি উত্তেজিত জনতাকে মরিশ শিভেলিয়েরের সঙ্গে কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গান গাইতে। সেদিন শহরে ছিল অফুরন্ত হাসি, মদের ফোয়ারা। আর আজ।

সমস্ত শহর নীরব, নিস্তব্ধ। নির্জন রাস্তা দিয়ে আমি ভীতুর মতো এগিয়ে চলেছি। আমি ভাবি, জয়-পরাজয় যখন এ সংসারের চিরন্তন রীতি, তখন এ নিয়ে আক্ষেপ করে কী হবে।

* * *

এমনি ভাবে যখন চোরের মতো দিন কাটাচ্ছি—তখন আমার সঙ্গে হঠাৎ একদিন সদানন্দের দেখা।

জাতে সিংহলী, পেশায় ভবঘুরে, সদানন্দ এসেছিল প্যারীতে রাজরোগের চিকিৎসা করতে। সদানন্দকে পেয়ে আমি খুশী। মনে খুলে তবু দুটো কথা বলতে পারব। দু-একদিনের মধ্যে সদানন্দ হল আমার পরম বন্ধু। রোজ রোজ ওর বাড়িতে বসে আড্ডা দিই। ধর্মনীতি থেকে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করি।

একদিন বিকেলে সদানন্দের বাড়িতে যাচ্ছি—এমন সময় পেছন থেকে কে যেন আমার নাম ধরে ডাকলে। পেছনে তাকিয়ে দেখি, আমার অতীতের বন্ধু লিউটেনাণ্ট 'এম'।

লিউটেনাণ্ট 'এম' আমার পূর্বপরিচিত। ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন আমাদের মধ্যে হৃদ্যতা হয়। সাহিত্য ছিল আমাদের মুখরোচক বিষয়—যা নিয়ে আমরা দিনের পর দিন সময় কাটিয়েছি। আজ বহুদিন বাদে লিউটেনাণ্ট এমকে দেখে আমি বিস্মিত না হয়ে পারি নি।

লিউটেনাণ্ট 'এম'কে দেখে এগিয়ে যাই। জিজ্ঞেস করি: কী খবর? তুমি এখানে? আমি তো ভেবেছিলাম তুমি যুদ্ধপ্রান্তে।

লিউটেনাণ্ট 'এম' ছিলেন ফরাসী চীফ অব দি স্টাফ বাহিনীর একজন

উচ্চপদস্থ কর্মচারী। লড়াই শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে লিউটেনাণ্ট 'এম' যুদ্ধপ্রান্তে চলে যান। তারপর বহুদিন লিউটেনাণ্ট 'এম'এর কাছ থেকে আমি কোন খবর পাই নি।

আজ লিউটেনাণ্ট 'এমের' পোশাক দেখে আমি অবাক হলাম। সাধারণ জনসাধারণের পোশাক। আমি একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম: 'এ কী ব্যাপার। সৈন্যবাহিনী ছাড়লে কবে?'

জবাব দিলে লিউটেনাণ্ট 'এম': লড়াই শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে।

তারপর গলা নীচু করে বললে: 'জানাশোনা কোথাও নিরিবিলি জায়গা আছে? মন খুলে দুদণ্ড তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। পুলিশ আমার পেছনে আছে। প্রকাশ্যে কথা বলার জো নেই।'

এবার আমার কৌতূহল বাড়ে। তাড়াতাড়ি লিউটেনাণ্ট 'এম'কে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসি।

* * *

লিউটেনাণ্ট 'এম' বেশ ক্লান্ত।

বললে: মুখুজ্যে, একটু কফি বানাতে পার।

কফি তৈরী করে দুজনে গল্প করতে বসলাম।

কথাটা আমিই প্রথমে শুরু করি। বলি: ফ্রণ্টের কী খবর?'

সহজ কণ্ঠে লিউটেনাণ্ট 'এম' জবাব দিলে: লড়াই শেষ হয়ে গেল। এ যাত্রায় হেরে গেলাম। আর এ পরাজয়ের জন্যে আমরা নিজেরাই দায়ী।

লিউটেনাণ্ট 'এম' বলতে থাকে: মুখুজ্যে, পরাজয়ের গ্লানি থেকে আমরা রেহাই পেতাম যদি ইংরেজ ও আমেরিকা ভের্সাইর সন্ধির সময় আমাদের কথা শুনত। আমাদের সর্তকবাণীকে অগ্রাহ্য করে ইংরেজ ও আমেরিকা জার্মান-শিল্প ও বাণিজ্যকে গড়ে তুলেছে। আর তাদেরই টাকায় পুষ্ট হয়েছে হিটলার। এর পরিণামে আজ এই বিশ্বব্যাপী লড়াই শুরু হয়েছে।

এবার আমার বলবার পালা। উত্তর দিই: যাই বলো না কেন, জার্মানদের মত শক্তিশালী, কর্মঠ জাতিকে দাবিয়ে রাখা সহজ নয়।

আমার কথা শুনে লিউটেনাণ্ট 'এম' চীৎকার করে ওঠে। বলে, আমি তোমায় হলপ করে বলতে পারি মুখুজ্যে, এই জার্মানজাতি অল্প কয়েকদিনের মধ্যে পৃথিবীর সবার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে। তারা কর্মঠ, এ কথা অস্বীকার করি নে। কিন্তু তাদের শক্তিশালী হবার প্রধান কারণ অন্যজাতির সহানুভূতি ও তাদের সাহায্য।

একটু চুপ করে থেকে লিউটেনাণ্ট 'এম' বলে, অস্বীকার করব না যে এই পরিণামের জন্যে আমরাও অনেকটা দায়ী। যদি আমরা হুঁশিয়ার হতাম, যদি আমাদের উপযুক্ত নেতা থাকত, তবে আমরা এ লড়াইকে এড়াতে পারতাম।

'তার মানে?' আমি কৌতূহলী কণ্ঠে প্রশ্ন করি।

মানে অতি সহজ ও সরল। এই ধরো না আমাদের সৈন্যবাহিনীর কথা। আমি ছিলাম চীফ অব দি আর্মি স্টাফের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কাজেই সৈন্যবাহিনীর সব দোষত্রুটিই আমার নখদর্পণে। যাক, এবার আমাদের সৈন্যবাহিনীর কথা ভেবে দেখো। লড়াই যখন শুরু হল তখন আমাদের নেই হাতিয়ার, নেই কোনো যুদ্ধের সরঞ্জাম। বলতে পার কিসের জোরে আমরা লড়াই করতে গিয়েছি। মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ দিনের রসদ নিয়ে আমরা লড়াইতে নেমেছিলাম। শুনলে অবাক হবে, কিন্তু এ সত্যি কথা।

'তারপর লড়াইর কথা ভেবে দেখো। লড়াইর সর্বপ্রথম জিনিস হল 'আক্রমণ'। আমরা সারাটা যুদ্ধ চুপচাপ বসে রয়েছি, আক্রমণ করি নি। আমাদের জেনারেল এই যুদ্ধে কিছুই করেন নি। শুধু লড়াইর রিপোর্ট হেড কোয়ার্টারে পাঠানো ছিল তার কাজ।'

আর সৈন্যও ছিল আমাদের কম। পনেরোই মে অবধি জার্মানদের হাতে ছিল ১৭৫ ডিভিশন আর আমাদের ছিল ১১৫ ডিভিশন। কিন্তু [illegible] ব্যবস্থা ছিল এমন চমৎকার যে প্রয়োজন হলে তারা এই বাহিনীকে দুশো ডিভিশন অবধি করতে পারত। আমাদের জেনারেলদের অভিযোগ যে ইংরেজরা যুদ্ধ করতে উপযুক্ত সৈন্য পাঠায় নি। এ রকম দোষারোপ করা

নিতান্ত মূর্খামি। লড়াই শুরু হবার কিছু দিন আগে ইংরেজরা দলে মাত্র সৈন্যবাহিনী গঠন করতে শুরু করেছিল। অতএব তাদের কাছ থেকে সৈন্য আশা করা নেহাত বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। এক কথায় আমাদের না ছিল সৈন্য, না ছিল লড়াইর রসদ।

আমি বলি : তাহলে দোষটা কার ?

জোর গলায় লিউটেনাণ্ট 'এম' বলে : দোষটা আর কারো নয়, আমাদের। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আমাদের শিক্ষা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কিছুই শিখি নি। ভাবতে পার আমাদের প্রধান সেনাপতি সময় কাটান সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্র নিয়ে আর প্রধান মন্ত্রীর সময় কাটে বিলাসিতা নিয়ে। দেশের ভালো-মন্দ নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই তাদের।

বুঝতে অসুবিধে হয় না লিউটেনাণ্ট 'এম' কাদের উদ্দেশ্য করে এই কথাগুলো বলছেন। প্রধান মন্ত্রী পল রেনো ও মাদাম এলেন স্ত পোত্তের কেলেঙ্কারি তখন কারো অজানা নেই। বাজারে কিংবদন্তী ছিল যে রেনো, লড়াই শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে কুড়ি হাজার ফ্রাঙ্ক ও প্রচুর হীরা-জহরত স্পেন দেশে পাঠাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন।

লিউটেনাণ্ট এম বলতে থাকে—আমাদের ভাগ্যে জুটেছে তৃতীয় শ্রেণীর দেশনেতা যারা বছরের পর বছর দেশের পররাষ্ট্রনীতিকে নীচু স্তরে নিয়ে গেছে। আর সেই নীতি বিদেশে আমাদের মান খুইয়েছে, মুদ্রার দাম কমিয়েছে আর নিয়ে গেছে আমাদের ধ্বংসের পথে। ভাবতে লজ্জা হয় মুখুজ্যে, এইসব তৃতীয় শ্রেণী দেশনেতাদের জন্যে আজ আমরা প্রাণ দিতে বসেছি।

'আমি চুপ করে বসে রইলাম। লিউটেনাণ্ট 'এম'ও নীরব। কথা বলতে বলতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। বাইরে তখন সান্ধ্য আইন, বেরুবার জো নেই। বিশেষ করে লিউটেনাণ্ট 'এমের' পক্ষে, কারণ পুলিশের শুভদৃষ্টিকে তাকে এড়াতে হয়।

সেই রাতটা লিউটেনাণ্ট 'এম' আমার ঘরে শুয়ে কাটালে। পরদিন

সকালে বিদায় নেবার সময় তার চোখে জল এল। আমার হাত ধরে বললেন, 'মুখুজ্যে, ফরাসী দেশকে ভুল বুঝো না। ভেবো না আমরা কাপুরুষ, লড়াই করতে ভয় পাই। আমাদের এই দুর্দিন চিরস্থায়ী নয়। আমরা আবার আমাদের শক্তি ফিরে পাব, পৃথিবীর মাঝে আবার আমাদের স্থান হবে।'

'লিউটেনাণ্ট 'এমের' সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। এর পরে তার কাছ থেকে আমি কোন খবর পাই নি। কিন্তু তার শেষ কথাগুলো আমি আজো ভুলি নি।

কয়েকদিন বাদে সদানন্দের খবর নিতে গিয়ে শুনতে পেলাম যে, সে মারা গেছে।

পরিচিত দুজন বন্ধুকে এতো শিগগির হারাব এ আমি ভাবতে পারি নি।

আমি যখন প্যারীর রাস্তায় ভবঘুরে, হিটলার তখন নতুন আক্রমণে ব্যস্ত।

ফ্রান্স দখল করে এবার তিনি রাশিয়ার পানে তাকালেন।

রাশিয়ার প্রতি আক্রোশ তাঁর বহুদিনের। কর্মজীবনে বহুবার, বহুক্ষেত্রে তিনি রাশিয়াকে গালিগালাজ করে এসেছেন। তাই এবার তিনি ইংল্যাণ্ড আক্রমণ ক্ষণিকের জন্যে স্থগিত রাখলেন। তাঁর শিবিরে আবার সৈন্যবাহিনীর বড়ো কর্তাদের তলব হল। নতুন আক্রমণের আয়োজন শুরু হল। আক্রমণের নামকরণ হল 'অপারেশন বারবোরসা'।

সেনাপতিরা যখন আক্রমণের নক্শা নিয়ে ব্যস্ত, পররাষ্ট্র-মন্ত্রী রিবেনট্রপ তখন নিরপেক্ষ দেশগুলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। চেষ্টা, কী করে তাদের দলের টানা যায়।

প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হল। স্পেনের নেতা ফ্রাঙ্কো সোজাসুজি জানালেন যে লড়াইয়ে যোগ দিতে তাঁর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।

তারপর হিটলার ইংলণ্ডের সঙ্গে সন্ধির চেষ্টা করলেন।

* * *

১০ই মে, ১৯৪০।

হিটলারের বহুদিনের বিশ্বস্ত অনুচর রুডলফ হেস একদিন প্লেনে করে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে তিনি ইংলণ্ডের পানে রওনা হলেন।

রুডলফ হেস নাৎসী দলের একজন বিশ্বস্ত চাঁই—হিটলারের অনুগত ভৃত্য। অন্ধের মতো তিনি হিটলারকে আজীবন বিশ্বাস করে এসেছেন।

লড়াই শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে হেসের প্রতিপত্তি কমতে থাকে। দেশের শাসনে বা সৈন্যবিভাগে তার কোনো ক্ষমতা নেই। দলের মধ্যে তাঁর চাইতে ক্ষমতাশালী হিটলারের সেক্রেটারি মার্টিন বোরম্যান। তাই হেস ঠিক করলেন যে এবার তিনি এমন কিছু একটা চমকপ্রদ করবেন যাতে হিটলারের তাক লেগে যায়। তাই হিটলারের অজ্ঞাতসারে তিনি স্কটল্যাণ্ডের পানে রওনা দিলেন।

ইগালসহ্যাম, স্কটল্যাণ্ডের একটি ছোট জায়গা। সেখানে এসে হেস

নামলেন। নামার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করলে। হেস বললেন যে তিনি ডিউক অফ হ্যামিলটনের সঙ্গে দেখা করতে চান।

ডিউক অফ হ্যামিলটন তাঁর পূর্ব পরিচিত। বার্লিনে অলিম্পিক খেলার সময় তাঁদের দুজনে বন্ধুত্ব হয়েছিল। ডিউক অফ হ্যামিলটনকে এবার হেস তাঁর আসল সংকল্প খুলে বললেন। জানালেন যে ইংরাজের সঙ্গে জার্মানি ঝগড়া মেটাবার জন্যে প্রস্তুত শুধু কয়েকটি শর্তে। প্রথমত, ইউরোপের ব্যাপারে ইংরেজ মাথা মামাবে না। দ্বিতীয়ত, অতীতের জার্মান উপনিবেশগুলো ফেরত দিতে হবে আর সন্ধির আলোচনা ইংরেজ প্রধান মন্ত্রী চার্চিলকে বাদ দিয়ে করতে হবে।

হেসের স্কটল্যাণ্ডে যাবার কথা শুনে হিটলার তেলেবেগুনে জলে উঠলেন। তাঁরই বিশ্বস্ত অনুচর তাঁরই অজ্ঞাতসারে শত্রুর দেশে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে যেতে পারে এ তিনি কখনও কল্পনা করেন নি। হুকুম দিলেন যে হেস দেশে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলতে।

এদিকে ডিউক অব হ্যামিলটন মারফত হেসের প্রস্তাব শুনে চার্চিল শুধু হাসলেন। জার্মানির সঙ্গে সন্ধি! অসম্ভব।

তিনি সজোরে ঘোষণা করলেন, ফ্রান্সের যুদ্ধ শেষ হয়েছে বটে কিন্তু ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধের শুরু।

২২শে জুন, ১৯৪১।

ফ্রান্সের সঙ্গে সন্ধির ঠিক এক বছর বাদে। একদিন ভোরে সূর্য ওঠার আগে জার্মান সাঁজোয়া বাহিনী এগিয়ে চলে রাশিয়ার দিকে। সেই বাহিনীর পুরোভাগে আছেন তিন বিখ্যাত জার্মান সেনাপতি লিব, বক্‌ ও ফন রুনস্টাড্ট। সৈন্যবলও কম নয়—উনিশ হাজার সাঁজোয়া বাহিনী, বারো হাজার মোটর বাহিনী। এ ছাড়া হাওয়াই জাহাজ অগুনতি—প্রায় তিন হাজারের মতো।

বন্ধু-বান্ধব, শত্রু-মিত্র সবাইকে হতভম্ব করে হিটলার নতুন আক্রমণ শুরু করলেন।

আট

এই দীর্ঘ এক বছর আমারও সময় কাটে নানা দুর্যোগের ভেতর দিয়ে।

টাকাকড়ির টানাটানি আর বাইরে পুলিশের আতঙ্ক, আমার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। আমি শত্রুদলভুক্ত, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার জো নেই। বাইরে থেকে পয়সা-কড়ি আসার কথাই ওঠে না। আর আমার মতো বিদেশীর পক্ষে চাকুরি সংগ্রহ প্রায় অসম্ভব। এই রকম নানান দুশ্চিন্তার ভেতর দিয়ে যখন দিন কাটছে তখন একদিন মাঝ রাতে আমার বাড়িতে ঘণ্টা বাজতে শুরু করল।

ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং।

ঘুমন্ত চোখ নিয়ে দরজা খুলতে গেলাম।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন আমার মাথার উপর রিভলবার তুলে ধরলে।

আমার মনে হল আমি যেন লোমহর্ষক ডিটেকটিভ উপন্যাসের নায়ক। শত্রুর কবলে পড়েছি।

রিভলবারধারী লোকটি ফরাসী পুলিশ। তার পেছনে আছে জার্মান একটি সৈন্য।

কোন ভূমিকা না করে ফরাসী পুলিশটি বলে : কোথায় দেখি তোমার পাশপোর্ট।

কাগজপত্র যা ছিল দেখালাম। তারপর ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম, ব্যাপার-খানা কি?

ফরাসী পুলিশটি আমার প্রশ্নকে এড়িয়ে গেল। বললে জামা-কাপড় পরে তৈরী হয়ে নাও। আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে। তোমার কাগজপত্র আমরা আরো ভালো করে দেখব।

বুঝলাম যে ফরাসী পুলিশের কাছ থেকে বিশেষ কিছু জানা যাবে না। তাই জার্মান সৈন্যটিকে জার্মান ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কী খুলে বলো তো?

আমার মুখে জার্মান শুনে লোকটি প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গেল। একটু হকচকিয়ে জবাব দিলে : আমি কিছুই জানি নে। তারপর একটু ভেবে উত্তর দেয় : C'est la guerre, এ হল লড়াই।

এরপর আমি যাই জিজ্ঞেস করি জার্মান সৈন্যটি ফরাসী ভাষায় এ তিনটি শব্দ বলে। বুঝতে অসুবিধে হল না যে লোকটার ফরাসী বিদ্যে ঐ তিনটি শব্দ অবধি। ইতিমধ্যে ফরাসী পুলিশটি অস্থির হয়ে ওঠে। প্রস্তুত হবার জন্যে বার বার তাগিদ দেয়। আমায় বেশী সময় দিতে নারাজ।

থানায় এলাম।

*　　　*　　　*

থানায় এসে আবার জেরা শুরু হল। কাগজপত্র পরীক্ষার পর হুকুম হল জুতা-মোজা খুলে ফেলবার জন্য।

বিস্মিত হয়ে কারণ জানবার জন্যে প্রশ্ন করতে যাব ভাবছি, এমনি সময় দেখতে পেলাম যে আমার মতো আর কয়েকজনকে ধরে আনা হয়েছে।

ছত্রিশ জাতের লোক—ইংরেজী বিদ্যা বা ইংল্যাণ্ড সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই বললেই চলে। তবু তারা আমার মতোই বন্দী।

দেশে থাকতে ছিলাম ইংরেজের শত্রু। তাই আমাকে জেলে যেতে হয়েছিল। আর আজ ইংরেজের প্রজা বলে আমাকে কয়েদখানায় টানা হল।

একেই বলে ভাগ্য।

জেলখানার গাড়ি এল একটু বাদে।

সারি বেঁধে সবাই গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম।

ওজর, আপত্তি কিছুই প্রকাশ করার জো নেই। আর করলেই বা কে শোনে?

শহরের বুক দিয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলে। আমি রাস্তার পানে তাকিয়ে দেখি, কর্মব্যস্ত জনতা উর্ধশ্বাসে এগিয়ে চলেছে। তাদের জীবনের তালে কোন পরিবর্তন হয় নি। দেখলে মনে হয় না যে তারা স্বাধীনতা হারিয়েছে।

নিজের মনে ভাবি যে আমরা শুধু অভাগা। সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে আমরা কিনা হলাম রাজবন্দী। হারালাম নিজেদের স্বাধীনতা।

একমনে কতোক্ষণ এই সব আকাশ পাতাল ভেবেছি মনে নেই। হঠাৎ গাড়ির ঝাঁকুনিতে আমার চিন্তা ভাঙল। তাকিয়ে দেখি গাড়ি এসে একটা বড়ো দালানের সামনে দাঁড়িয়েছে। সামনে একটা সাইন বোর্ড। বড়ো বড়ো অক্ষরে তাতে লেখা—ফ্রেজনের বন্দীশালা।

* * *

ফ্রেজনের বন্দীশালা।

কিংবদন্তী হিসেবে এর নাম শুনেছিলাম বটে কিন্তু কখনও নিজের চোখে দেখি নি। আমার কাছে এ কারাগার ছিল অনেকটা রূপকথার কাহিনীর মতো। গল্পে আর কাগজপত্রে এর নাম শুনেছি, কিন্তু আমার ভাগ্যে যে কখনও এটা হবে আশ্রয়, এ ভাবি নি।

লাইন বেঁধে আমরা সবাই লৌহকপাটের ভেতরে গেলাম। যাবার সময় কোন প্রতিবাদ শুনি নি। নীরবে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবতে ভাবতে ঢুকে গেছি।

জেলখানার ভেতরে এসে আবার সবাই গোল হয়ে দাঁড়ালাম। আমি তৃষ্ণায় কাতর, জলের সন্ধানে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, এমনি সময় স্পষ্ট বাংলায় কে যেন আমার নাম ধরে ডাকলে—'গিরিজা।'

পেছনে তাকিয়ে দেখি—কুসুম পাল।

'আজাদ হিন্দ রেডিও—এবার বাংলায় খবর বলছি'—পুরো যুদ্ধের সময় কুসুম পালের শ্রীহট্টের সে কণ্ঠস্বর আজো হয়তো বাঙালীরা ভুলে যান নি।

তার বাংলায় সংবাদ বলার ভঙ্গী আজো আমার মনে লীন হয়ে আছে। বছর বাদে আমরা যখন ক্রেমনের বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে আজাদ হিন্দ রেডিও গঠন করি, কুসুম পাল তখন ছিলেন আমাদের বাংলার নিউজ রীডার।

আজ এই ছত্রিশ জাতের মাঝে সিলেটের কুসুম পালকে দেখে যে আশ্চর্য হই নি এ কথা অস্বীকার করব না। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় লণ্ডনে লিসেস্টার স্কোয়ারে। কুসুম পাল যে প্যারীতে, এ কথা আমার অজানা ছিল।

আমায় দেখে কুসুম পাল এগিয়ে এল। বললে, গিরিজা ভয় পেও না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি যেন মনে একটু জোর পাই। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করি, খবরটা কোথায় পেলে হে।

কুসুম পাল হেসে জবাব দেয়, জার্মানরা বলছে। ভারতীয়দের বেশীদিন আটকে রাখা হবে না।

কুসুমের সিলেটের কণ্ঠস্বর শুনে আগে আমার হাসি পেত, কিন্তু আজ মনে হল যে ওর কথায় আমি যেন নতুন জীবন পেয়েছি।

কুসুমকে নিয়ে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করলাম, যদি কিছু হয়। কিন্তু কিছুই হল না। মন খুলে দুজনে কথা বলি।

আজ এই দুঃখের মাঝে বাংলায় কথা বলে আনন্দ লাভ করি। বুঝতে পারি মাতৃভাষার মাধুর্য কোথায়।

*   *   *

একটু বাদে আবার আমাদের তলব হল। এক ছোকরা জার্মান লিউটেনাণ্ট কাগজপত্র নিয়ে এল। বললে, বলো তোমাদের কাহিনী। আমি লিখব।

প্রথমেই বললাম, আমি গিরিজা মুখুজ্যে, জাতে ভারতীয়, পেশা সাংবাদিক, ইংরেজের প্রজা।

আমার কথা শুনে লিউটেনাণ্ট তো অবাক।

জাতে ভারতীয় আর ইংরেজের প্রজা। আমার কথা লোকটা বিশ্বাস

করতে চায় না।. এ কী করে সম্ভব। আমি যতোই বলি যে ভারতবর্ষ হল ইংরেজের খাস তালুকদারি, লোকটা ততোই মাথা নাড়ে।

লিউটেনান্ট ছিল ভারী ভালো লোক। হয়তো আমার মুখে জার্মান ভাষা শুনে একটু খুশীই হয়েছিল। এবার দুজনে গল্প শুরু করে দিলাম। আলোচনার বিষয়বস্তু অবশ্য যুদ্ধ নিয়ে অর্থাৎ কতোদিন এ লড়াই চলবে। লিউটেনান্টের দৃঢ় বিশ্বাস, এ লড়াই ক্ষণস্থায়ী। বলে, আর বেশি দিন নয়। ইংরেজ সন্ধিপত্র নিয়ে এল বলে।

কথাটা আমি সহজে বিশ্বাস করতে পারি নে। আমার বিশ্বাস, এ লড়াই অল্পদিনের নয়।

লিউটেনান্ট এবার কী জানি ভাবলে। তারপর একটু গম্ভীর কণ্ঠস্বরে বললে, হের মুখুজ্যে, তোমার এই কষ্টের জন্যে আমি ভারি দুঃখিত। কিন্তু কী করব, উপায় নেই। চারদিককার অবস্থা তো দেখতে পাচ্ছ! কয়েকটা দিন সবুর করো, সব ঠিক হয়ে যাবে।

লিউটেনান্টের কথা শুনে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। ভাবি, মুক্তির তাহলে আর বেশী দেরি নেই। স্বাধীনতার রঙীন স্বপ্নে আমি মশগুল হয়ে উঠি। কিছুক্ষণ বাদে একটা লোক এসে রুটি বিলি করে গেল।

সঙ্গীদের মধ্যে কেউ কেউ সার্ডিনের টিন লুকিয়ে নিয়ে এসেছিল। টিন খুলে পরম আনন্দের সঙ্গে তারা রুটি দিয়ে সার্ডিন খেতে লাগল।

আর আমি বসে বসে ভাবি, কী হবে কয়েদখানায় খেয়ে। একটু বাদেই মুক্তি মিলবে। জেল থেকে বেরিয়ে বেশ ভালো করে খাওয়া যাবে।

মানুষের আশা আর বিধাতার ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য আছে। তাই যা ভেবেছিলাম, ঘটল ঠিক তার উল্টো। একটা লোক এসে আমাকে বললে, এসো আমার সঙ্গে।

বুঝতে পারলাম এবার আমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। মনের আনন্দে দ্রুতলয়ে পা ফেলে তার সঙ্গে গেলাম। লোকটা আমাকে সোজা নিয়ে এল এক ছোট ঘরে। বললে, এই তোমার ঘর।

আমি প্রতিবাদ জানাই। বলি, সে কী, আমি তো ভেবেছিলাম আমায় ছেড়ে দেওয়া হবে।

একটু হেসে লোকটা বলে, কী করব। যা আদেশ পেয়েছি তাই করছি।

তারপর আমার মুখের উপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

* * *

হতাশ হয়ে শেষ অবধি ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতোক্ষণ শুয়ে ছিলাম জানি নে কিন্তু হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ পেয়ে ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি যে লোকটি আমায় নিয়ে এসেছিল সে আরও দুজন অপরিচিতকে নিয়ে এসেছে। বুঝতে দেরি হল না এরাও আমার মতো বন্দী। লোক দুটোকে আমার ঘরের ভেতর পুরে দিয়ে কর্মচারীটি চলে গেল।

আমি নিরাশ হয়ে আবার কড়িকাঠ গুনতে শুরু করে দিলাম। ভাবতে ভাবতে আমার মনে পড়ল গুরুদেবের একটি কবিতা......

কতো অজানারে জানাইলে তুমি, কতো ঘরে দিলে ঠাঁই।

নিজের মনে কবিতাটি আউড়ে একটু আশ্চর্য বোধ করলাম। স্বপ্নেও কখনও ভাবি নি অজানা অচেনাকে নিয়ে এমনি ভাবে আমাকে একদিন রাত কাটাতে হবে।

* * *

কেরানী জীবন আর কয়েদখানার জীবনের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। দুটোই ঢিমে রেলগাড়ির মতো চলে। আনন্দ নেই, বৈচিত্র্য নেই। শুধু থাকে আতঙ্ক, হয় চাকুরি খোয়াবার কিংবা মুক্তি পাবার।

বৈচিত্র্যহীন জীবনের মধ্যে আমি নতুনত্বের সন্ধানে থাকি। বন্দীশালায় সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে আলাপ করি, জানতে চেষ্টা করি তাদের সুখ-দুঃখের কাহিনী, কোথায় তারা মানুষ, কোন দেশের লোক। মানুষকে জানবার আগ্রহ, তাকে কাছে পাবার নেশা আমার ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠল। দূরের

বেশ যেমনি সঙ্গীত-পিয়াসীকে আকর্ষণ করে তেমনি সঙ্গীতের ব্যথার টানে আমি তাদের কাছে এগিয়ে গেলাম। ভুলতে পারলাম যে আমায় ঘিরে আছে এক দানব লৌহকপাট।

কারাগার জীবন বিখ্যাত লেখক অস্কার ওয়াইল্ডকে দিয়েছিল 'ডি প্রফানডিস' রচনা করার প্রেরণা আর আমায় দিয়েছিল বন্ধুত্বের মধুর আস্বাদ।

অতি অল্প কয়েকদিনের মধ্যে রীতিমতো একটা দল গড়ে ফেললাম। কারণ দল পাকানো বাঙালীর মজ্জাগত অভ্যাস। কয়েদখানায় এসেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। পরিচিতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ল।

কিছুদিন বাদে আমার জীবনে এক বৈচিত্র্য এল। আদেশ পেলাম কিছুক্ষণের জন্যে ঘরের বাইরে পাইচারি করবার। হুকুম শুনে মনটা খুশী হল। যাক্ আবার তাহলে রঙীন আকাশ দেখতে পাবো।

ঘরের বাইরে এসে হঠাৎ একদিন বিল লংএর সঙ্গে দেখা। বিল লং আমার সরবোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী। ইচ্ছে হলো ওর সাথে গিয়ে কথা বলি কিন্তু প্রহরীর তীক্ষ্ন দৃষ্টি দেখে এগিয়ে যাবার সাহস হল না।

ভাবছি কী করে বিল লংএর সাথে আলাপ করতে পারি এমনি সময় ওয়ার্ডার এসে বললে যে আমার জন্যে এক ভিজিটর বাইরে প্রতীক্ষা করছে। কয়েদখানার কর্তৃপক্ষ তার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দিয়েছেন।

কথাটা শুনে প্রথমে আমার বিস্ময় হল। এ সুদূর অপরিচিত দেশে কে আমার জন্য প্রতীক্ষা করতে পারে ভেবে আমি আকুল হলাম। চিন্তা অবশ্য বেশীক্ষণ করতে হল না কারণ ওয়ার্ডারের সঙ্গে বাইরে এসে দেখি মারী—ফ্রাসোঁর বোন।

মারীকে দেখে আমি অবাক হলাম। ভাবতে পারি নি যে জেলের আঙিনার বাইরে কেউ আমার কথা ভাবছে। আমার দুর্দশায় কারো কোন সহানুভূতি হতে পারে এ আমার কল্পনার বাইরে ছিল।

মারী বললে, জানো মুখুজ্যে, আমার সাথে ক্রাগোঁয়ার আসবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু আসবার অনুমতি পায় নি। আমি ওদের ধন্যবাদ জানালাম।

আস্তে আস্তে মারী প্রশ্ন করে, কেমন লাগছে জেলখানার জীবন?

আমি কোন কিছু জবাব দেবার আগেই মারী বললে, নাও, তোমার ব্যবহারের জন্যে কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে এসেছি। এই বলে আমার হাতে একটা ছোট প্যাকেট তুলে দিল। জেলখানায় জিনিসগুলো সত্যিই প্রয়োজনীয় বটে। সাবান, টুথপেস্ট, ব্লেড। জিনিসগুলো পেয়ে মনে হল আমি যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছি। আমি বললাম, ধন্যবাদ। তোমার মা কেমন আছেন মারী?

মারীর কাছে পেলাম বাইরের জগতের খবর—লড়াইয়ের পরিস্থিতি। চারদিকেই তখন জার্মান বাহিনীর জয়-জয়কার।

একটু বাদে ওয়ার্ডারের রূঢ় কণ্ঠস্বর আমাদের আলাপ-আলোচনাকে শেষ করে দিলে।

আমার পানে তাকিয়ে ওয়ার্ডার বলে, সময় হয়ে গেছে। চলো।

সেদিন মারীর সঙ্গে কথা বলে আমি যে আনন্দ পেয়েছিলাম তা ভুলবার নয়। কারণ এ সংসারে আমি একা নই, আমারও হিতৈষী বন্ধু আছে এ কথা ভেবে আমি মনে জোর পেলাম।

*   *   *

কয়েক দিনের মধ্যে আমার খুদে সংসারের সমস্ত ভারতীয়দের সঙ্গে পরিচয় হল। আলাপ হল মাধব রাওয়ের সঙ্গে।

স্তর কার্জন ওয়াহিলকে খুন করার অভিযোগে তাকে দেশ ত্যাগ করে প্যারীতে এসে বসবাস করতে হয়েছিল।

উইলিয়ামসন বলে আর একটা লোক এসে আমায় একদিন বললে সে ভারতীয়। একটু বাদেই প্রতিবাদ শুনতে পেলাম, না লোকটা হাবসী।

উইলিয়ামসনের মাথায় পাগড়ির রং কালো। ভারতীয় বলে পরিচয়

দেবার সমস্ত বৈশিষ্ট্যই তার আছে। একদিন উইলিয়ামসনের পেশা জানবার কৌতূহল হল। জিজ্ঞেস করলাম: কী কর তুমি?

আমার পেশার কথা জিজ্ঞেস করছ?—উইলিয়ামসন জবাব দেয়।

ছাটস রাইট—আমি উত্তর দিই।

একটু হতাশের কণ্ঠে উইলিয়ামসন জবাব দেয়: আর বলো কেন। আমি হলাম দার্শনিক—ভারতীয় দর্শনের শিক্ষক। সাহেবদের ভারতীয় দর্শন শেখাই।

উইলিয়ামসনের জবাব শুনে আমি একটু উৎসাহিত বোধ করি। যাক, তবু জেলখানায় বসে বসে একটু গভীর তথ্য নিয়ে আলোচনা করা যাবে। কারণ দর্শন বিষয়টি আমার বিশেষ প্রিয়।

বললাম: তোমার দর্শনে ব্যুৎপত্তি শুনে ভারি খুশী হলাম। যাক, ভারতীয় দর্শনের কোনটা তোমার ভালো লাগে। শঙ্করাচার্যের……

আমার কথা শেষ হবার আগেই উইলিয়ামসন লাফিয়ে উঠল। বললে: শঙ্করার কথা বলছো। ওকে একবার হাতের কাছে পেলে এমনি শিক্ষা দেব যে বাছাধন টেরটা পাবেখন। বাবা ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি।

নিজের ভুল বুঝতে পারলাম। কারণ প্যারীতে শঙ্কর বলে তখন এক জ্যোতিষী ছিল। লোকের হাত দেখা ছিল তার পেশা। শঙ্করাচার্য বলতে উইলিয়ামসন তাকেই ভেবেছে!

উইলিয়ামসনের সাথে শঙ্করাচার্যের দর্শন নিয়ে আলোচনা সেদিনকার মতো স্থগিত রাখলাম।

কয়েকদিন বাদেই টের পেলাম উইলিয়ামসনের আসর জমাবার ক্ষমতা আছে। দাদা, ভাই বলে সবাইকে সে হাত করলে। হাত দেখে বলতে শুরু করল যে কবে পাবে মুক্তি। উপদেশ আর বক্তৃতা দুটোই তার মুখে খইয়ের মতো ফোটে।

উইলিয়ামসনের পরনে আলখাল্লা দেখে আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম: কি ব্যাপার। তুমি কি মৌলভী বনে গেলে নাকি?

জিভ কেটে উইলিয়ামসন জবাব দেয়, কী যে বলছ। আমি মৌলভী হতে যাব কেন? হ্যাঁ তবে কোরানটা আমার জানা আছে ভালো করে। বলতে পার কণ্ঠস্থ।

উইলিয়ামসনের কোরানের জ্ঞান যাচাই করার সুযোগ আমার কোনদিন হয় নি।

*   *   *

উইলিয়ামসন একদিন আমার হাত দেখে বললে: মুখুজ্যে, তোমার মুক্তি আসন্ন।

সচরাচর আমি উইলিয়ামসনকে বিশ্বাস করি নে কিন্তু আজ করলাম। হয়তো নিজের মনকে শান্তি দেবার জন্যে।

মুক্তির স্বপ্নে আমি তখন বিভোর। রোজই ভাবি আজ জেল কর্তৃপক্ষ মুক্তির আদেশনামা নিয়ে আসবে। দিন কেটে মাস গেল—জেলের লৌহকপাট খুলল না। চিন্তা ভাবনায় একদিন আমি অসুখে পড়লাম।

জ্বরের ঘোরে আমি অজ্ঞান। আবোল তাবোল বেশ বকলাম। প্রথমত প্রলাপ, দ্বিতীয়ত ভাষাটা বাংলা, জেলের সঙ্গীদের কাছে অপরিচিত ভাষা। আমার মুখে বাংলা ভাষা শুনে তারা ভাবল আমার প্রলাপ বেড়েছে। কেউ কেউ বললে: এ যাত্রায় আর মুখুজ্যেকে বাঁচানো গেল না।

ডাক্তার-বদ্যির তলব হল। চিকিৎসারও ত্রুটি নেই। অসুখ সারার সঙ্গে সঙ্গে আদেশ হল যে আমায় ফ্রেজনের কয়েদখানা থেকে অন্যত্র নিয়ে যেতে হবে।

যাবার আয়োজন হল।

*   *   *

জন-কোলাহলমুখরিত প্যারীর বুকের ভেতর দিয়ে আমাদের প্রিজন ভ্যান এগিয়ে যায়।

আজ বদ্ধ খাঁচা থেকে আমি প্যারী শহরকে নতুন করে দেখতে পাই। কতো বসন্ত, কতো শীত আমি এই শহরের বুকে দেখেছি কিন্তু কখনও আমি সেরূপ মুগ্ধ হই নি। কিন্তু আজ প্যারীকে আমি নতুন করে দেখতে পেলাম।

ঐ তো দূরে দেখা যায় আইফেল তুর—শেন নদী। তার জলের কলতান যেন আমার কানে ভেসে আসে। জনকোলাহলমুখরিত রাস্তার দু পাশে ক্যাফে। তার ভেতর নাগরিক জীবন বয়ে চলেছে অলস, মন্থর গতিতে।

আমার মনে হয় এই সংসারে অদল-বদল আছে সত্য কিন্তু প্যারীর জীবনে নেই। এই লড়াই যেন তার কোন পরিবর্তন আনে নি। এখানে জীবন চলে ঝরনাধারার মতো—এক গতিতে—এক পানে।

অবাক হয়ে ভাবি কোথায় যাচ্ছি। ভাবনার হাত থেকে রেহাই দেন আমার সঙ্গী। অস্ফুট স্বরে বলেন. কোথায় যাচ্ছি জান। সাঁতেনীর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে।

কথাটা শুনে চমকে উঠি। সাঁতেনীর কনসেনট্রেশন ক্যাম্প!

ভাবতে গা-টা শিউরে ওঠে।

রূপকথায় পড়েছি পাতালপুরীর কথা যেখানে রাজপুত্রদের বন্দী করে রাখা হত। যৌবনে রাজনৈতিক জীবনে পেয়েছিলাম তারই আভাস ইংরেজের কারাগারে। আজ সাঁতেনীর ক্যাম্পের কথা শুনে আমার সেই অতীতের স্মৃতি মনে এল। কখনও কল্পনা করি নি, আমার ভাগ্যে আবার একদিন এমনি স্থানে ঠাঁই মিলবে। ভাবলাম একেই বলে ভাগ্যবিধাতার প্রহসন।

একটু বাদেই গাড়ী এসে সাঁতেনীর ব্যারাকে ঢুকল। বন্ধ হয়ে গেল পেছনের

দরজা। প্যারীর সৌন্দর্য নিমেষে মিলিয়ে গেল। আমি এলাম এক নতুন জগতে।

*　　　　*　　　　*

আগের দিনে সমাজচ্যুত হলে ব্রাহ্মণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজে উঠতে হত।

আজকে সাঁন্তেনীর ক্যাম্পে প্রায়শ্চিত্ত করে আবার আমরা সমাজে ঠাঁই পেলাম। কারণ ফ্রেজনের বন্দীশালা থেকে সাঁন্তেনীর বেশী কৌলিণ্য। ইতিহাসে আছে যে, ফরাসী সম্রাট পঞ্চদশ লুই তাঁর খাস বরকন্দাজদের জন্যে এই ক্যাম্প বানিয়েছিলেন—বন্দী রাখার জন্যে নয়—তাদের থাকবার জন্যে। কালের করাল গ্রাসে আজ সেই আশ্রয় হয়েছে ফরাসীদের বন্দীশালা।

প্রায়শ্চিত্ত করাতে এলেন ডাক্তার সার্জেন্ট। মন্ত্র পড়ার মতো তাদের কাছে নানা প্রশ্নের জবাবাদহি দিলাম। সব কিছুর পর আমার ভাগ্যে মিলল একটি ছোট ঘর।

ঘর পেয়ে আমি খুশী। ভারী ভালো বন্দোবস্ত। বদ্ধ খাঁচায় আটক থাকার আশঙ্কা নেই। অবারিত উন্মুক্ত দ্বার। মাথার উপর নেই আইন-কানুন।

নিজের ঘর দেখে নিজের মনে তারিফ করছি, তখন কে যেন আমার নাম ধরে পেছন থেকে ডাকল—মুখুজ্যে।

পেছনে তাকিয়ে দেখি কোলতফ—ফ্রেজনের ক্যাম্পের বন্ধু। পরিচিতদের মধ্যে আমার সাথে কোলতফের ঘনিষ্ঠতা আছে। তাই আজ তাকে দেখে খুশীই হলাম।

আমার ঘর দেখে কোলতফের ভারী পছন্দ। তারিফ করে বলে: ভারী ভালো ঘর পেয়েছো মুখুজ্যে। আমার লোভ হচ্ছে তোমার সঙ্গী হবার।

কোলতফকে রুমমেট হিসেবে নিতে আমার একটু দ্বিধা নেই। তার প্রস্তাবে রাজী হলাম।

কোলতফ এল আমার ঘরে।

*　　　　　　*　　　　　　*

অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সাঁজেনীর ক্যাম্পে আমাদের নিয়ে এক বিচিত্র সংসার গড়ে উঠল।

আমরা সবাই নানা জাতের নানা মতের মানুষ কিন্তু সবার হৃদয় যেন একই সুরে গাঁথা। যতোই দিন যায় ততোই আমাদের প্রীতি বাড়ে। একে অন্যকে চিনি।

আমাদের এই হাট বাজারে আছে সব, কিছুরই অভাব নেই। নাট্যকার, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী এক কথায় হল বত্রিশ ভাজার সংসার।

হিউগ মিলস জাতে ইংরেজ, মনে প্রাণে নাট্যকার। আর আছে ভানি গ্রাবল—মিলসের সহধর্মী। ব্যবসায়ী এরিক পাওয়ার স্থানীয় এক ব্যাঙ্কের কর্ণধার। ধনী শৌখীন ক্লড ডেসমার। ইঞ্জিনিয়ার জক। জিনিস বেচতে গ্লাসগো থেকে প্যারীতে এসেছিল। এসে দেখে ফেরবার পথ নেই। শত্রু যাবার পথ আটকে আছে। ভাগ্য নিয়ে দুঃখ করে নি জক। নগদ যা পেয়েছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট রয়েছে।

আমাদের এই বিচিত্র সংসারে আর ছিলেন ফাদার রিউমার।

*　　　　　　*　　　　　　*

যেখানে সংবাদের দুর্ভিক্ষ সেখানেই আছেন ফাদার রিউমার। সাঁজেনীর ক্যাম্পে এটা ছিল প্রবাদবাক্য।

ফাদার রিউমার জাতে ছিলেন ইংরেজ, পেশায় ছিলেন সৈনিক। তারপর হঠাৎ একদিন খাকী ছেড়ে ধরলেন গেরুয়া। অস্ত্রের লড়াই থেকে এলেন ধর্মের লড়াইতে। মিলিটারী কোড বন্ধ করে পড়তে শুরু করলেন বাইবেল।

ফাদার রিউমারের আদর্শ 'মিথ্যা বৈ সত্যি কথা বলিবে না'। ফাদার রিউমার হাসিখুশিতে টইটুম্বুর। তার রসালো কাহিনী বাইবেলের গল্পের চাইতে উৎকর্ষ। এক কথায় বলতে পারি, তিনি ছিলেন আমাদের দুঃখের জীবনে একমাত্র আলোক।

জীবন যখন গতানুগতিক ভাবে বয়ে যায় তখনই ফাদার রিউমার আনেন

দরজা। প্যারীর সৌন্দর্য নিমেষে মিলিয়ে গেল। আমি এলাম এক নতুন জগতে।

*　　　　*　　　　*

আগের দিনে সমাজচ্যুত হলে ব্রাহ্মণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজে উঠতে হত।

আজকে সাঁতেনীর ক্যাম্পে প্রায়শ্চিত্ত করে আবার আমরা সমাজে ঠাঁই পেলাম। কারণ ক্রেজনের বন্দীশালা থেকে সাঁতেনীর বেশী কৌলিণ্য। ইতিহাসে আছে যে, ফরাসী সম্রাট পঞ্চদশ লুই তাঁর খাস বরকন্দাজদের জন্যে এই ক্যাম্প বানিয়েছিলেন—বন্দী রাখার জন্যে নয়—তাদের থাকবার জন্যে। কালের করাল গ্রাসে আজ সেই আশ্রয় হয়েছে ফরাসীদের বন্দীশালা।

প্রায়শ্চিত্ত করাতে এলেন ডাক্তার সার্জেন্ট। মন্ত্র পড়ার মতো তাদের কাছে নানা প্রশ্নের জবাবাদহি দিলাম। সব কিছুর পর আমার ভাগ্যে মিলল একটি ছোট ঘর।

ঘর পেয়ে আমি খুশী। ভারী ভালো বন্দোবস্ত। বদ্ধ খাঁচায় আটক থাকার আশঙ্কা নেই। অবারিত উন্মুক্ত দ্বার। মাথার উপর নেই আইন-কানুন।

নিজের ঘর দেখে নিজের মনে তারিফ করছি, তখন কে যেন আমার নাম ধরে পেছন থেকে ডাকল—মুখুজ্যে।

পেছনে তাকিয়ে দেখি কোলতফ—ক্রেজনের ক্যাম্পের বন্ধু। পরিচিতদের মধ্যে আমার সাথে কোলতফের ঘনিষ্ঠতা আছে। তাই আজ তাকে দেখে খুশীই হলাম।

আমার ঘর দেখে কোলতফের ভারী পছন্দ। তারিফ করে বলে: ভারী ভালো ঘর পেয়েছো মুখুজ্যে। আমার লোভ হচ্ছে তোমার সঙ্গী হবার।

কোলতফকে রুমমেট হিসেবে নিতে আমার একটু দ্বিধা নেই। তার প্রস্তাবে রাজী হলাম।

কোলতফ এল আমার ঘরে।

*   *   *

অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সাঁভেনীর ক্যাম্পে আমাদের নিয়ে এক বিচিত্র সংসার গড়ে উঠল।

আমরা সবাই নানা জাতের নানা মতের মানুষ কিন্তু সবার হৃদয় যেন একই সুরে গাঁথা। যতোই দিন যায় ততোই আমাদের প্রীতি বাড়ে। একে অন্যকে চিনি।

আমাদের এই হাট বাজারে আছে সব, কিছুরই অভাব নেই। নাট্যকার, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী এক কথায় হল বত্রিশ ভাজার সংসার।

হিউগ মিলস জাতে ইংরেজ, মনে প্রাণে নাট্যকার। আর আছে ডানি গ্রাবল—মিলসের সহধর্মী। ব্যবসায়ী এরিক পাওয়ার স্থানীয় এক ব্যাঙ্কের কর্ণধার। ধনী শৌখীন ক্লড ডেসমার। ইঞ্জিনিয়ার জক। জিনিস বেচতে গ্লাসগো থেকে প্যারীতে এসেছিল। এসে দেখে ফেরবার পথ নেই। শত্রু যাবার পথ আটকে আছে। ভাগ্য নিয়ে দুঃখ করে নি জক। নগদ যা পেয়েছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট রয়েছে।

আমাদের এই বিচিত্র সংসারে আর ছিলেন ফাদার রিউমার।

*   *   *

যেখানে সংবাদের দুর্ভিক্ষ সেখানেই আছেন ফাদার রিউমার। সাঁভেনীর ক্যাম্পে এটা ছিল প্রবাদবাক্য।

ফাদার রিউমার জাতে ছিলেন ইংরেজ, পেশায় ছিলেন সৈনিক। তারপর হঠাৎ একদিন খাকী ছেড়ে ধরলেন গেরুয়া। অস্ত্রের লড়াই থেকে এলেন ধর্মের লড়াইতে। মিলিটারী কোড বন্ধ করে পড়তে শুরু করলেন বাইবেল।

ফাদার রিউমারের আদর্শ 'মিথ্যা বৈ সত্যি কথা বলিবে না'। ফাদার রিউমার হাসিখুশিতে টইটুম্বুর। তার রসালো কাহিনী বাইবেলের গল্পের চাইতে উৎকর্ষ। এক কথায় বলতে পারি, তিনি ছিলেন আমাদের দুঃখের জীবনে একমাত্র আলোক।

জীবন যখন গতানুগতিক ভাবে বয়ে যায় তখনই ফাদার রিউমার আনেন

চাঞ্চল্য। একদিন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। আমরা সবাই ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলাম : কী ব্যাপার ?

হাঁপাতে হাঁপাতে ফাদার রিউমার জবাব দেন : আর বলো কেন ? মরেছে সব ব্যাটারা।

জিজ্ঞেস করি : কাদের কথা বলছেন ফাদার ?

কার কথা আর। জার্মান ব্যাটারা গিয়েছিল লণ্ডন আক্রমণ করতে। সেইখানে গিয়ে ব্যাটারা হাত পুড়িয়েছে। বিস্তর ক্ষতি হয়েছে ব্যাটাদের এই আক্রমণে।

ফাটকা বাজারের শেয়ারের মতো ফাদার রিউমারের মুখে মৃত্যু ও ক্ষতির সংখ্যা বাড়তে থাকে। সকালের মৃত্যুসংখ্যা কুড়ি হাজার, বিকেলে বেড়ে হয় একলাখ। কেউ যদি প্রতিবাদ করে বলেন : এ কি, এই তো সকালে বলছিলেন মাত্র কুড়ি হাজার লোক মরেছে আর এখন বলছেন একলাখ !

হটবার পাত্র নন ফাদার রিউমার। হেসে জবাব দেন : ভায়া হে। কুড়ি হাজার তো বলেছিলুম সকাল দশটায়। আর এখন তো বিকেল পাঁচটা, ঘণ্টায় কুড়ি হাজার হিসেবে পাঁচ ঘণ্টায় কতো হয় বলতে পারো। একলাখ, তাই নয় কি ?

এর পরে আর কিছু বলা চলে না।

আমাদের চুপ করে থাকতে দেখে ফাদার রিউমার বলেন : সত্যি বলছি ভাই। এ কাহিনী আমার অক্তের কাছে শোনা। যা শুনেছি—তাই বলছি।

নিত্যি নতুন এমনি ধরনের হরেক রকমের গল্প শুনতাম ফাদার রিউমারের কাছে।

তাই আমরা বলতাম ফাদার রিউমার আমাদের জেলখানার একমাত্র আনন্দের উৎস।

* * *

সাঁভেনীর ক্যাম্পে আরো কয়েকজন ভারতীয় ছিল। আজকে এদের মধ্যে কুমুদ পাল ও চৌধুরীর নাম মনে পড়ে।

চৌধুরী হলেন 'নেতাজী বোসের' সতীর্থ—কটকে র‍্যাভেন্শ কলেজের সহপাঠী।

শ্রীহট্টের কুসুম পাল, তার কাহিনী আগেই বলেছি। সাঁভেনীর ক্যাম্পে তার একমাত্র বন্ধু লর্ড বংশের নন্দন লর্ড হেলসবারি। ঘটনাচক্রে লর্ড হেলসবারিও আমাদের মতো সাঁভেনীর রাজ-অতিথি। লড়াই বাধবার আগে তিনি মহানন্দে প্যারীতে দিন কাটাচ্ছিলেন। তারপর হঠাৎ একদিন জার্মান বাহিনী এসে প্যারী দখল করে নিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হলেন লর্ড হেলসবারি।

লর্ড হেলসবারিকে চিনতে দেরি হয় নি জার্মান কর্তৃপক্ষের। যখন তারা বুঝতে পারল যে এই গ্রেপ্তার অন্যাবশ্যক তখন তারা মুক্তি দিলে হিজ লর্ডশিপকে।

স্বাধীনতা পেয়ে লর্ডশিপ তাঁর ফ্রীডম অব স্পীচের সদব্যবহার করলেন। প্রকাশ্যে রাস্তায় একদিন মদের ঝোঁকে জার্মান সরকারের গালিগালাজ শুরু করলেন। অতএব ক্যাফে থেকে হিজ লর্ডশিপ সোজা এলেন সাঁভেনীর প্রিজন ক্যাম্পে।

লর্ড হেলসবারি এক বিচিত্র মানুষ। আচার ব্যবহার, জীবনযাত্রা সবই স্বতন্ত্র। সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলেন—একমাত্র কুসুমই তাঁর বন্ধু—তার সুখ দুঃখের সহায়।

লর্ড হেলসবারী ছিলেন নীরব শ্রোতা—কুসুম নিত্যি নতুন তাকে ভারতে ইংরেজের অত্যাচার, অবিচারের কাহিনী শোনায়। লর্ডশিপ অম্লান বদনে তাই শোনেন।

তাই কুসুম পাল ও লর্ডশিপে ছিল পরম বন্ধুত্ব।

ক্যাম্পের জীবন কাটে এক তালে।

সে জীবনে নেই বৈচিত্র্য, নেই চাঞ্চল্য। বাইরের জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন

হয়ে আছি। ক্যাম্পের প্রাচীর ও বিচিত্র সংসারের মাঝে মাঝে মনে হয় আমি যেন অন্য পৃথিবীর মানুষ।

রোজ সকালে উঠে গতর দিয়ে কাজ করতে হত। অনভিজ্ঞ, অনভ্যস্ত তবু বেশ কিছুদিনের মধ্যে এ কাজে পারদর্শী হয়ে উঠলাম। বিকেল হয়ে গেলে বসতাম বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে। সেইখানে বসে চর্চা হত রাজনীতি আর দর্শন নিয়ে—ইহকাল থেকে পরকাল নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা।

কোন তর্কেরই মীমাংসা নেই—আমাদের আলোচনারও ছিল না। বিভিন্ন মতামত আর বিভিন্ন নীতি নিয়ে আমরা তর্কের জাল বুনতাম। তবু এ তর্কের মাঝে আমি যেন সঙ্গীদের চিনতে পারতাম। কারণ এই আলোচনার মাঝে মাঝে তাঁরা শোনাতেন তাঁদের সুখদুঃখের কাহিনী। শত্রুর হাত থেকে তাঁদের রেহাই পাবার ব্যর্থ চেষ্টা—আর তাঁদের ঘরোয়া কাহিনী।

তাঁদের কাহিনী শুনে মনে হত সত্যিই এ সংসারে অভাগা শুধু আমি একাই নয়—আরো অনেকে আছেন।

আমরা যারা ভারতীয় সাঁতেনীর ক্যাম্পে ছিলাম, তার মধ্যে অধিকাংশই প্রায় যুগ ধরে দেশের বাইরে দিন কাটিয়েছেন। তাই দেশের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছিল। এঁরা ছিলেন পরিচয়ে ভারতীয় কিন্তু চিন্তাধারায় ইউরোপীয়।

আমার এই ভারতীয় বন্ধুদের কাছে দেশের অতীত প্রায় অজ্ঞাত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ধূসর। তাই এঁদের সঙ্গে অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার জন্যে এক বৈঠক বসালাম। কিন্তু আসর জমল না কারণ এই আলোচনার চাইতে আমার বন্ধুরা মুক্তির চিন্তায় ব্যাকুল।

গুজর বলে এক ভারতীয় সর্বপ্রথম আমাদের আসর ত্যাগ করে সাঁতেনীর কয়েদখানা ত্যাগ করলে। ধনী ব্যবসায়ী গুজর—টাকায় কি না হয় এ মন্ত্র

তার বিলক্ষণ জানা আছে। কয়েদখানার বড়ো কর্তাদের হাত করতে তার একটু অসুবিধে হল না।

কয়েকদিন বাদে সগর্বে গুজর কয়েদখানা থেকে বেড়িয়ে গেল।

গুজরের মুক্তি তার অন্যান্য সঙ্গীদের ভেতর এক আলোড়নের সৃষ্টি করলে। সবারই এক চিন্তা—এক ধ্যান—কি করে জেলখানার কর্তাদের হাত করা যায়। মুক্তির পথ গুজর দেখিয়েছে—অতএব সেই পথ অবলম্বন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

অতএব আমার আলোচনার আসরে ফাঁকি দিয়ে সবাই সাঁন্তেনীর কর্তৃপক্ষের কাছে ধরণা দিতে শুরু করল।

হতাশ হয়ে আমি আবার কয়েদখানার কড়িকাঠ গুনতে শুরু করলাম।

ইতিমধ্যে আমার বিদেশী বন্ধুদের কারু কারু সঙ্গে একটু ঝগড়া হয়ে গেল। ঝগড়ার কারণ আর কিছু নয়—আমার গায়ের রঙ। যে সমস্যার সমাধান কোনদিন হয় নি এবং হবেও না।

একদিন কাজ করছি এমনি সময় কে যেন আমায় বললে ডার্টি ইণ্ডিয়ান।

কথাটা শুনে আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। আমি হিংস্র বাঘের মতো লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

ঝগড়া মেটাতে দুজনে ছুটে এল। কিন্তু আমি তখন রাগে অন্ধ—কারু কথাই শুনি নে। কাজেই আমাকে শান্ত করাতে তাদের বেশ বেগ পেতে হল।

আমি সাধারণতঃ শান্ত প্রকৃতির লোক, ঝগড়া বিবাদ আমার ধাতে নেই। কিন্তু সেদিনকার ঝগড়ার পর আমি কয়েকটা দিন বেশ উত্তেজনার ভেতর দিয়ে কাটালাম।

*　　*　　*

বিখ্যাত উপন্যাসিক আলেকজান্দার দ্যুমার কাউণ্ট অব মণ্টেক্রস্টোর নায়ক

একমনে রাতে তাঁর জেলখানা থেকে স্বপ্ন দেখতেন তাঁর মুক্তির।" ভাবতেন আবার কবে তিনি দেখা পাবেন তাঁর প্রেয়সীর।

বন্ধ সাঁত্তেনীর কারাগার থেকে আমিও স্বপ্ন দেখতাম আমার মুক্তির। ভাবতাম কবে আমার দেশকে দেখতে পাব। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত তার সবুজ বনানী—নদ, নদী, পাহাড়, পর্বত। আমার কানে যেন ভেসে আসতো অসংখ্য নাগরিকের মুক্তির দাবি—তাদের কণ্ঠস্বর 'বন্দেমাতরম।'

একদিন খবর পেলাম যে আমার কল্পনা, শুধু স্বপ্ন নয়—নয় দূর আকাশের মরীচিকা। সত্যিই দেশব্যাপী উঠেছে স্বাধীনতার দাবি—সবাই একই কণ্ঠে সুর মিলিয়ে গাইছে—আজাদ হিন্দ—জিন্দাবাদ।'

সময়টা আগস্ট মাস—১৯৪২।

শুনতে পেলাম আমার মতোই জেলখানায় আটক রয়েছেন মহাত্মা গান্ধী। একদিন খবর এল নেহেরুও গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁদের অপরাধ তাঁদের দেশপ্রেম।

জেলখানায় বসে এই সব খবর শুনে আমি চঞ্চল হয়ে উঠতাম। আমি ভাবতাম কবে আমার মুক্তি মিলবে—আবার কবে আমি দেখতে পাব দেশের মাটি।

*　　　*　　　*

দশ

ইতিমধ্যে লড়াইর গতি আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। পশ্চিম রণাঙ্গনে হিটলার তখন দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাসের ঘরের মতো একটার পর একটা শহর জার্মান আক্রমণের কাছে ভেঙে পড়ছে।

লেনিনগ্রাডের শাসনে এসে জার্মানবাহিনী থমকে দাঁড়াল। পাল্টা জবাব দেবার জন্যে রুশবাহিনী রুখে দাঁড়ায়। হিটলার হুকুম দিলেন: লেনিনগ্রাড-আমার চাই-ই যেমনি করে হোক।'

আদেশ শুনে সৈন্যবাহিনীর কর্তারা হতভম্ব। তাদের কাছে লেনিনগ্রাডের চাইতে মস্কাউর গুরুত্ব অনেক বেশী। একবার মস্কাউ নিতে পারিলে সমস্ত দেশ তাদের হাতের মুঠোয় ভেতর চলে আসবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁরা হিটলারকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হিটলারের এক গোঁ—লেনিনগ্রাড আমার চাই।'

পশ্চিম রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি তখন চারজন—জেনারেল ব্রাউসিস্ত—জেনারেল হালদার, জেনারেল রুনস্টাড, ও জেনারেল ফন গুডেরিয়ান।'

হিটলারের আদেশানুযায়ী তারা এবার মৌমাছির ঝাঁকে মতো লেনিন-গ্রাডের উপর আক্রমণ চালালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। জার্মান বাহিনীর কাছে রুশ সৈন্যবাহিনী মাথা নত করলে না। বেগতিক দেখে হিটলার সৈন্যবাহিনীর কর্তাদের প্রস্তাব মেনে নিলেন। লেনিনগ্রাড ছেড়ে এবার মস্কাউর উপর আক্রমণ শুরু হল।

তখন পৌষ মাস—সবে মাত্র শীতের বাতাস বইতে শুরু করেছে। ডিসেম্বরের দুই তারিখ—বিকেল প্রায় তিনটে। সূর্যি ডোবে-ডোবে। আঁধার নেমে আসছে পৃথিবীর বুকে। বরফ পড়ছে অবিশ্রান্ত। এমনি সময় হঠাৎ জার্মান বাহিনীর কামান গর্জে উঠল। মস্কাউর উপর এই শেষ আক্রমণ। এই আক্রমণ চালালেন জেনারেল ফনক্লুগ।

কিন্তু সব আক্রমণই ব্যর্থ হল। এক বিন্দু জমি দখল করতে পারলে না জার্মান বাহিনী।

*　　　*　　　*

এই আক্রমণে ব্যর্থ হয়ে হিটলার দমলেন না।

তার এক গোঁ—মস্কাউ আমার চাই।

ইতিমধ্যে শীত ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছে। দেড়শো বছর আগে এমনি এক দুর্যোগে সম্রাট নাপোলিও একদিন মস্কাউ আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু সেদিন তাঁকে প্রকৃতির কাছে মাথা নিচু করতে হয়েছিল।

আজ হিটলার আবার প্রকৃতিকে অবজ্ঞা করার চেষ্টা করলেন। সৈন্য-বাহিনীকে ঢালা হুকুম দিলেন: 'মস্কাউ দখল না করে জার্মান বাহিনী এক ইঞ্চিও পেছপাও হবে না।'

প্রথম শাস্তি মিলল জেনারেল রুনস্টাডের। রুষ্টভ আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি ব্যর্থ হলেন। হিটলার তাঁকে রেহাই দিলেন না।

মস্কাউর উপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন ফন গুডেরিয়ান। ব্যর্থ হবার জন্যে তাঁকে শাস্তি পেতে হল। জেনারেল ফন ওয়েপনায়ারের শাস্তি হল আরো কঠোর—সৈন্যবাহিনী থেকে তাকে বরখাস্ত করা হল।

এমনি কঠোর শাস্তি দিতে হিটলার যখন ব্যস্ত তখন একদিন রুশ বাহিনী প্রতিআক্রমণ চালালে। দিনটা যুদ্ধের ইতিহাসে স্মরণীয়—৬ই ডিসেম্বর ১৯৪১।

সেইদিন থেকে হিটলারের ভাগ্যের পরিবর্তন শুরু হল।

লড়াইর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমারও জীবন অদল বদল হল।

একদিন জেনারেল কয়েদখানার বড়োকর্তার ঘরে তলব হল। ব্যাপারটা কি, এই নিয়ে যখন সাত পাঁচ ভাবছি, এমনি সময় দেখতে পেলাম যে আমার ভারতীয় সঙ্গীরাও বড়োকর্তার ঘরে যাচ্ছেন।

কয়েদখানার বড়োসাহেব কর্নেল স্মিট। তার ঘরে গিয়ে সবাই গোল হয়ে দাঁড়ালাম।

একটু বাদে কর্নেল স্মিট বেশ গুরুগম্ভীর চালে ঘরে ঢুকলেন। তার হাতে একখানা চিঠি। বেশ জোরে কর্নেল স্মিট সবাইকে চিঠিখানাকে পড়ে শোনালেন।

চিঠিখানা বার্লিনের পররাষ্ট্র দপ্তরের। জার্মান সরকার স্থির করেছেন সাঁতেনীর ভারতীয় বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে। কারণ অজ্ঞাত।

কর্নেল স্মিট চিঠিখানা পড়ে যখন শেষ করলেন তখন সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ, কারু মুখে টু শব্দ নেই। মনে হল আমরা যেন স্বপ্ন দেখছি। কখনও কল্পনা করিনি যে আবার দেখতে পাব আইফেল তুর বা সাঁ জেলেসি এঁভেলিদ।

কতক্ষণ আনমনে বসে ভাবছিলাম জানি নে—হঠাৎ বন্ধুদের মধ্যে এক গুঞ্জন শুনতে পেলাম। তাকিয়ে দেখলাম আমাদের এক সঙ্গী কর্নেল স্মিটকে বলছে : অশেষ অশেষ ধন্যবাদ কর্নেল স্মিট। আপনার দয়ার কথা কখনও ভুলব না।

*   *   *

এবার শুরু হল ঘর ভাঙবার পালা।

কি রাখি—কি নেবো সেইটে হল প্রধান চিন্তা। কয়েদখানার স্মৃতি চারদিকে ছড়িয়ে আছে। সেই থেকে বাছাই করা হল সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে আমি যখন ব্যস্ত তখন বন্ধুরা এগিয়ে এলেন অভিনন্দন জানাতে।

মিলস বলে : মুখুজ্যে, শুনে ভারি খুশী হলাম যে তুমি মুক্তি পেয়েছ।

: পাই নি এখনও— তবে পাবার আশা আছে—আমি জবাব দিই।

: তুমি যে ছাড়া পাবে এ আমি আগেই জানতুম—মিলস বলে।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলতে থাকে : জানো মুখুজ্যে, মুক্তির দিন আমিও গুনছি। শিগগিরই কয়েদখানার বাইরে যেতে পারব।'

চট করে মিলসের কথা বিশ্বাস করতে পারি নে। জানি নিজের মনকে

সান্ত্বনা দেবার জন্যে কথাগুলো বলছে। কারণ ও জাতে ইংরেজ। জার্মান কর্তৃপক্ষের হাত থেকে রেহাই পাওয়া সহজ কথা নয়।

সেদিন রাত্রে আমার মুক্তি নিয়ে ব্যারাকে বন্ধুদের মধ্যে বেশ হৈ-হল্লা হল। রাত্রে সেই উপলক্ষে একটা ছোট ডিনার হল। বন্ধুরা সবাই অভিনন্দন জানালেন। জবাবে কি বলেছিলাম আজ আমার মনে নেই—তবে যতোটুকু মনে হয় বিশেষ কিছু বলিনি। কারণ মুক্তির সংবাদে আমি বেশ একটু উত্তেজিত হয়েছিলাম। বড়ো বক্তৃতা দেবার মতো মনের অবস্থা ছিল না।

* * *

কথার গতি বাতাসের চাইতে দ্রুত।

তার প্রমাণ পেলাম পরদিন সকালে। সমস্ত কয়েদখানায় খবর রটে গেল যে ভারতীয়রা মুক্তি পেয়েছে। আমাদের যাত্রার আয়োজন করতে দেখে ইংরেজদের দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

কালো বলে যারা এতদিন আমাদের তাচ্ছিল্য করেছিল আজ তারাও নিজেদের রং তামাটে বলে জাহির করার চেষ্টা করলে। সবাই পূর্বপুরুষের ছড়া কাটতে লাগল—কবে কোন বছর তাদের বাপ-ঠাকুর্দা ভারতবর্ষ ত্যাগ করে বিদেশে এসেছিলেন। মাথার পাগড়ি দেখিয়ে উইলিয়ামসণ ভারতীয় বনে গেল যদিও তার পাসপোর্ট কানাডার। ভারতের নিকটেই মরিসাস। অতএব সে জায়গার লোকেরাও ভারতীয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এক কথায় যারা ক'স্মিনকালেও ভারতের নাম শোনে নি আজ তারাও ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে ব্যস্ত।

পরিচয় দেবার পর শুরু হল কাস্টমসের জেরা। ব্যারাকের বাইরে কাস্টমস। সেইখানে গিয়ে লাইন বেঁধে দাঁড়ালাম। প্রথমে শুরু হল খানাতল্লাসী—তারপর অজস্র প্রশ্নবান। কি রেখেছি—কি নিয়ে গেলাম, তার ফিরিস্তি। সব কিছুর হিসেবনিকেশ দিয়ে আমরা যখন ক্লান্ত তখন আমাদের যাবার হুকুম মিলল।

দেখতে পেলাম দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি।

গাড়ি আমাদের সোজা নিয়ে যাবে প্যারীতে। সবাই গিয়ে দল বেঁধে গাড়িতে উঠলাম।

একটু বাদেই পেছনে পড়ে রইল সাঁ ডেনীর কারাগার। অতীতকে ছাড়িয়ে এগিয়ে চললাম ভবিষ্যতের পানে। মনে হল যেন একটা যুগ পার হয়ে এলাম। এই কয়েদখানায় এসেছিলাম অজস্র কল্পনা নিয়ে, দেখেছিলাম মুক্তির স্বপ্ন। আজ আমার সে স্বপ্ন সফল হয়েছে। আজ আমার বাঁধন টুটেছে —আবার আমি ফিরে পেয়েছি আমার জগৎকে।

গাড়িতে আমার পাশে এক বৃদ্ধ ভারতীয় ব্যবসায়ী বসেছিলেন। দীর্ঘ-দিন ধরে এ অঞ্চলে তার বসবাস। এ দেশের মাটির সঙ্গে তার হৃদয় মিশে গেছে। আজ সাঁ ডেনীর কারাগারের পানে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন: 'হে আমার সোনার দেশ ভারতবর্ষ, আমি তোমায় করি সহস্র-সহস্র নমস্কার। আমি যে তোমার সন্তান—আজ সাঁ ডেনীর কারাগারে তা প্রথম টের পেলাম।'

আমার মনে হল বৃদ্ধ ব্যবসায়ী যেন আমার হৃদয়ের কথাই বলছে।

* • *

লৌহকপাটের অন্তরালে আমার দেহ ছিল পরাধীন—কিন্তু মন ছিল স্বাধীন। কিন্তু আজ বাইরে এসে দেখলাম যে দেহের স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছি সত্য কিন্তু আমার মন রয়েছে বদ্ধ খাঁচায়। আজ স্বাধীন গতিবিধির অধিকার আছে বটে কিন্তু স্বাধীন আলোচনার নেই। সাঁডেনীর কয়েদখানায় বসে যে আলোচনা করেছি আজ সাঁ জেলিসির কাফেতে বসে সে আলোচনা করতে অক্ষম!

আমি বিদেশী—আমার কাছে ব্যক্তি স্বাধীনতা মূল্যবান। তার কারণ হচ্ছে লেখা ও কথা দিয়ে আমাকে জীবন গুজরান করতে হয়! কিন্তু কয়েদখানা থেকে বেড়িয়ে এসে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে আমার জীবন-সমস্যা দূর হবার বদলে জীবন ক্রমেই দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে।

হিসেবের খাতা খুলে দেখি আয়ের অঙ্ক শূন্য কিন্তু ব্যয়ের মাত্রা কমে নি। এ বিশাল নগরীতে আমি অপরিচিত। এখানে সহানুভূতি পাওয়া হয়তো সম্ভব—কিন্তু অর্থ, অসম্ভব।

শুধু অর্থের চিন্তা নয়—রাজনৈতিক চিন্তাও ক্রমেই আমাকে ব্যাকুল করে তুলল।

তার কারণ লড়াই তখনও পুরোদমে চলছে।

এগারো

১৯৪২, জুন মাস।

পশ্চিম সীমান্তে যখন জার্মান বাহিনী মরিয়া হয়ে লড়ছে তখন দক্ষিণ-আফ্রিকার সীমান্তে এক নতুন বিপদ দেখা দিল।

জার্মানীর বন্ধু ইতালি। দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে মুসোলিনীর ইতালি হিমসিম খেয়ে গেল। আবেদন গেল হিটলারের কাছে—সাহায্য চাই। হিটলার রমেলকে পাঠালেন এই প্রান্তে ইতালিকে সাহায্য করতে।

রমেলের আগমনের সঙ্গে-সঙ্গে এই সীমান্তের যুদ্ধের গতি বদলে গেল। নতুন করে সৈন্যবাহিনীকে গঠন করে দুর্ধর্ষ সেনাপতি রমেল ইংরেজ-বাহিনীকে আক্রমণ করলেন। তার আক্রমণের কাছে মাথা নত করতে হল ইংরেজকে।

এল আলমাইনের কাছে, এসে রমেল তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে থামলেন। পঁয়ষট্টি মাইল দূরে মিশরের বন্দর আলেকজান্দ্রিয়া। একবার এই বন্দর ছিনিয়ে নিতে পারলে মিশরের রাজধানী কায়রো আসবে জার্মানীর হাতের মুঠোয়।

জার্মান-বাহিনীর অগ্রগতি দেখে ইংরেজ কর্তারা হতভম্ব। লণ্ডনে সোরগোল পড়ে গেল। রমেলের গতিকে রুখবার জন্যে চারদিকে সাঁজ-সাঁজ রব পড়ে গেল। সেনাপতি অদল বদল হল। জেনারেল অকিনলেকের জায়গায় এলেন জেনারেল আলেকজাণ্ডার। এইট্থ আর্মির কর্তা জেনারেল রিচির জায়গায় এলেন জেনারেল মণ্টোগোমারি।

নতুন করে আক্রমণ চালাবার জন্যে রমেল হিটলারের সাহায্য চাইলেন। বললেন আরো রসদ চাই। রমেলের প্রস্তাবে সায় দিলেন জেনারেল কেয়ারসিং ও এডমিরাল রেডার।

৪২-এর সেপ্টেম্বর মাসে একদিন হিটলারের শিবিরে রমেলের তলব হল।

হিটলারকে রমেল বললেন: 'আফ্রিকায় আমাদের জয় সুনিশ্চিত। শুধু মাত্র কিছু সাহায্য পেলেই আমি ইংরেজদের পিষে মারতে পারব।'

রমেলের কথা চুপ করে হিটলার শুনলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন: এল আলমাইন আলেকজান্দ্রিয়া থেকে কতদূর?

: পঁয়ষট্টি মাইল—রমেল জবাব দেন।

: 'বেশ রসদ পাঠাব—' হিটলার বলেন। হিটলার প্রতিশ্রুতি দিলেন সত্য, কিন্তু তার সমস্ত মন—চিন্তাধারা, পশ্চিম সীমান্তে মস্কাউর রণাঙ্গনে।

আশায় বুক বেঁধে রমেল উত্তর-আফ্রিকায় ফিরে চলেন। তার বাহিনী 'আফ্রিকাকোরের' মধ্যে উল্লাসের সাড়া পড়ে গেল। সবাই ভাবলে মিশর জয় সুনিশ্চিত।

কিন্তু কিছুদিন বাদেই তাদের নিরাশ হতে হল। প্রবল সৈন্য নিয়ে জেনারেল মণ্টগোমারি জার্মানবাহিনীর উপর হানা দিলেন। রমেল তখন অসুস্থ—হাসপাতালে। তবু এই আক্রমণ রুখবার জন্যে এগিয়ে চলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। না এল হিটলারের সাহায্য—না হল জয়লাভ।

আফ্রিকা প্রান্তে জার্মানবাহিনীকে পরাজয় স্বীকার করে নিতে হল।

* * *

আফ্রিকার লড়াইর শেষে রমেলের তলব হল ইউরোপে।

হিটলার প্রতিদিনই আশঙ্কা করছেন যে ইংরেজ ও আমেরিকান সৈন্য-বাহিনী নরোওয়ে আক্রমণ করবে। কয়েকদিন বাদেই বুঝতে পারলেন যে তার ধারণা ভ্রান্ত। মিত্রশক্তির আক্রমণের লক্ষ্যস্থল নরোওয়ে নয়—ইউরোপ।

এই আক্রমণ রুখবার ভার পেলেন জেনারেল রমেল ও জেনারেল রুনস্টাড।

ইতিমধ্যে রাশিয়ার সীমান্তে লড়াই ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে উঠছে। প্রকৃতির দুর্যোগে ও উপযুক্ত রসদের অভাবে জার্মানবাহিনী কাহিল হয়ে উঠেছে।

জুলাইয়ের শেষ। প্রবল সৈন্যবল নিয়ে হিটলার স্টালিনগ্রাডের উপর আক্রমণ চালালেন। কয়েকদিনের মধ্যে বিখ্যাত জার্মান পানজার বাহিনীর পদধ্বনি শোনা গেল স্টালিনগ্রাডের দুয়ারে। জয় যখন সুনিশ্চিত, তখন হঠাৎ হিটলার তার পরিকল্পনা পাল্টালেন। সৈন্যবাহিনীর এক অংশকে পাঠালেন ককেসাস তৈলখনির অঞ্চলে। লেনিনগ্রাড ও মস্কাউর আক্রমণের সময় যে ভুল তিনি করেছিলেন, আজ আবার সেই ভুল করলেন।

হিটলারের ভুলের সুযোগ নিলেন রুশ বাহিনী। রুশ সেনাপতি রকোসভস্কি প্রতি-আক্রমণ করলেন। বিপদ দেখে হিটলার কড়া হুকুম দিলেন যে সৈন্যবাহিনী এক ইঞ্চিও পেছপাও হতে পারবে না। আক্রমণ রুখবার ভার পড়ল জেনারেল ম্যানস্টাইনের উপর। কিন্তু ম্যানস্টাইনের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। অনুপায় দেখে স্টালিনগ্রাডের প্রধান জার্মান সেনাপতি জেনারেল পাউলাস হিটলারকে জানালেন : এ লড়াই অসম্ভব।

পাউলাসের কথা শুনে হিটলার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

: আত্মসমর্পণ, অসম্ভব। শেষ সৈন্য অবধি আমরা লড়াই করে যাব। এ হল 'ব্যাটল অব থার্মোপলি'।

কিন্তু শীতের তীব্র বাতাস ভেদ করে হিটলারের কথা পাউলাসের কানে গেল না। জানুয়ারির শেষে একদিন সমস্ত সৈন্যবাহিনী ও রসদ নিয়ে তিনি রাশিয়ানদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।

ভাগ্যের চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। আফ্রিকা গেল—এবার ভাঙন ধরল রাশিয়ার প্রান্তে।

কিন্তু বিধাতার এই ক্রূর পরিহাস হিটলার লক্ষ্য করলেন না। পরাজয়ের যে প্লাবন শুরু হয়েছে তাকে রুখবার ক্ষমতা হিটলার হারিয়েছেন।

যুদ্ধপ্রান্তে যখন ভাগ্যের অদলবদল হচ্ছে তখন আমি শীতের সঙ্গে লড়াই করে নাজেহাল হচ্ছি। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম দুঃসাহসের কাজ। তার জন্যে চাই অর্থবল—চাই মনের জোর। আমার দুটোরই অভাব। তাই ভাবতে শুরু করি কী করা যায়। এই ভাবনার সময় আমার পুরানো বন্ধু নাম্বিয়ার এসে হাজির।

গভীর সমুদ্রে বন্দরের আলোক দেখলে মানুষ যেমনি খুশী হয়, নাম্বিয়ারকে পেয়ে আমার সেই আনন্দ হল। প্রায় বছরখানেক আগে ওর কাছ থেকে একদিন বিদায় নিয়েছিলাম, তখন কল্পনা করি নি যে আবার ওকে দেখতে পাব।

নাম্বিয়ারের সঙ্গে বসে পুরাতন স্মৃতি রোমন্থন করা গেল। দেশের আগস্ট বিপ্লবের কাহিনী সাঁ ভেনীর কয়েখানায় বসে শুনেছিলাম। দেশনেতারা যে ইংরেজের হাতে বন্দী এ কথাটাও অজানা ছিল না।

ইতিমধ্যে জাপান ও আমেরিকার লড়াই বেশ ভালো করে বেধেছে। জাপানী বোমায় ধ্বংস হয়েছে পার্ল হারবার, পতন হয়েছে মালয়, সিঙ্গাপুর।

যুদ্ধের পরিস্থিতি আর ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুজনা আলোচনা করলাম। দুদিন থেকে নাম্বিয়ার চলে গেল। কয়েকদিন বাদে নাম্বিয়ার এসে হাজির। কোন ভূমিকা না করে সোজা প্রশ্ন করলে : বার্লিনে যাবে মুখুজ্যে ?

হতভম্ব হয়ে আমি জিজ্ঞেস করি, কোথায় বললে ?

—'বার্লিনে!' বেশ একটু জোর গলায় নাম্বিয়ার বলে।

বিস্ময় প্রকাশ করার আগেই নাম্বিয়ার জবাব দেয়, দেশের স্বাধীনতা নিয়ে লড়াই করবার জন্যে আমরা কয়েকজনা ভারতীয় একটা দল গঠন করেছি। সেই কাজের জন্যে তোমাকেও আমাদের প্রয়োজন মুখুজ্যে।

নাম্বিয়ারের কথা বিশ্বাস করতে মন সহজে চায় না। ভাবি, এ কী সম্ভব!

চারদিকে যখন যুদ্ধের আগুন জ্বলেছে তখন কী করে এই সংগ্রাম করব। আমার ভাবনার অন্ত নেই। সমস্ত ব্যাপারটা ভালো করে না জেনে অগ্রসর হতে মন চায় না। অথচ দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্যে আমি প্রস্তুত।

এমনি যখন দো-মনা হয়ে ভাবছি, তখন বাইরে তাকিয়ে দেখলাম বরফ ঝরতে শুরু করেছে। ভাবলাম এই প্রচণ্ড শীতে প্যারীতে দিন কাটানো অসম্ভব। হয়তো বার্লিনে গেলে এর হাত থেকে রেহাই পাব। ঠিক করলাম বার্লিনে যাব।

নাম্বিয়ারকে বললাম : যাব ভাই তোমার সাথে বার্লিনে।

পরদিন আমরা রওনা হলাম।

* * *

আমার এ যাত্রা ঐতিহাসিক।

যাবার আগে কখনও মনে জাগে নি যে কাজে যাচ্ছি একদিন তার কাহিনী দেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কখনও কল্পনা করিনি যে আমাদের এই কাজ আনবে দেশের মুক্তি, তুলবে স্বাধীনতার জয়ধ্বনি। তীব্র শীতে আমি তখন নেতিয়ে পড়েছিলাম। ভাববার অবকাশ ছিল না। যাবার সময় নাম্বিয়ারও আভাস দেয় নি কী কাজে যাচ্ছি।

প্রভাতের জনমানবহীন রাস্তা দিয়ে হেঁটে বার্লিনের ট্রেন ধরার জন্যে গেয়ার দ্য নর্ডে এসে পৌছলাম। ভ্রমণে আমার চিরদিনের আনন্দ কিন্তু আজ ট্রেনে চড়তে আমার কোন উৎসাহই এল না। আমার চারদিকের সমস্ত কিছুই, মাঠ, ঘাট, সব কিছুই নিরাশ, নিরানন্দ বলে মনে হল।

* * *

প্যারী থেকে বার্লিনে।

এ যেন নির্ব্বাসিতের ভ্রমণ-কাহিনী। ভবিষ্যৎ অন্ধকার, বর্ত্তমান কুয়াশায় আচ্ছন্ন। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে এগিয়ে চলি। গাড়ি এসে দাঁড়ায় স্টেশনে স্টেশনে। শীতে জর্জরিত যাত্রীর দল কোনপ্রকারে এসে গাড়িতে উঠে বসে। কুলীদের অবস্থা আরো সঙ্গীন। প্রচণ্ড শীতের সঙ্গে লড়াই করতে-করতে তারা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

সারাটা দিন নিরাশ ভাবেই কাটল। সেই ভাবেই কাটল সারাটা রাত্রি। পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি ফ্রান্সের সীমানা পার হয়ে জার্মানির ভেতর

দিয়ে যাচ্ছি। বাইরে তাকালেই বুঝতে পারা যায় এ দু দেশের পার্থক্য। কাল দেখেছি সবুজ বন—আজ দেখতে পেলাম রুক্ষ পৃথিবী।

দুপুর বারোটা নাগাদ গাড়ি এসে পটাসডাম বাহানকে এসে পৌছল।

* * *

স্টেশনে একটি ভারতীয় ছাত্র এসেছিল দেখা করতে। তার সঙ্গে আমরা এলাম এসপ্লানেড হোটেলে।

হোটেলে বসে যখন জিরুচ্ছি তখন নাম্বিয়ার বললে: 'মুখুজ্যে তোমায় একটা গোপন কথা বলব।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি: গোপন কথা! কৈ কাল রাত্রে ট্রেনে তো এর কিছু আভাস দাও নি।

দিই নি, তার কারণ বলতে মানা ছিল—নাম্বিয়ার হেসে জবাব দেয়। একটু চুপ করে থেকে নাম্বিয়ার বলে: জানো গিরিজা, সুভাষ বোস জার্মানিতে। আজ তার সঙ্গে আমাদের লাঞ্চ খাবার নেমন্তন্ন।

নাম্বিয়ারের কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হলাম। সুভাষ বোস জার্মানিতে। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। ভাবলাম দিনে-দুপুরে স্বপ্ন দেখছি।

* * *

সুভাষ বোস জার্মানিতে এসেছে, এ ছিল আমার কল্পনার অতীত। এই সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে এসে কখনও মুখোমুখি যে সুভাষের দেখা পাব এ আমি কল্পনা করি নি।

নাম্বিয়ারের মুখে সুভাষের আগমনের কথা শুনে চীৎকার করে বললাম: সুভাষ এখানে। কৈ আগে তো কিছু বল নি।

হেসে নাম্বিয়ার জবাব দেয়: বলেছি তো, বলতে নিষেধ ছিল। বার্লিনে এলেই তোমাকে বলা হবে এ ছিল আমার প্রতি নির্দেশ।

নাম্বিয়ারের জবাব শুনে আমার রাগ পড়ে গেল।

একটু বাদে নাম্বিয়ার আমাকে সুভাষের কাছে নিয়ে এল।

সেদিনকার অনুষ্ঠানের উপলক্ষ ছিল সুভাষের জন্মদিন। প্রকৃতপক্ষে জন্মদিন ছিল আগের দিন। কিন্তু আমরা সবাই আসছি শুনে অনুষ্ঠানের দিনটা পেছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একটু বাদে বার্লিনের আরো কয়েকজন ভারতীয় এল সুভাষকে জন্মদিনের শুভকামনা জানাতে। সুভাষ তাদের সাথে হাসিঠাট্টা শুরু করল।

আমি বিস্মিত হয়ে সুভাষের পাঁনে তাকিয়ে রইলাম। প্রায় এক যুগ বাদে ওকে দেখতে পেয়েছি। ১৯৩১ সাল। কলকাতায় ছাত্র আন্দোলনের নেতা হিসেবে সুভাষের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। আজ সুভাষকে দেখে মনে হল যেন ওর বহু পরিবর্তন হয়েছে। বয়সের সাথে অভিজ্ঞতাও বেড়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। খাবার টেবিলে বসে দুজনে অতীত নিয়ে কথা হল। সুভাষ বললে সিটি কলেজের অধ্যাপক হেরম্ব মৈত্র'র গল্প, প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপালকে ধরে মার দেওয়ার কাহিনী। এই আলোচনা করার সময় আমার মনে হল আমি যেন কলকাতায় বসে গল্প করছি।

একটু বাদে আমাদের আলোচনায় ভাঁটা পড়ে।

এবার আমরা সবাই মিলে সুভাষের বাড়ি সোফিয়েন ষ্ট্রসেতে গেলাম। আমাদের অভিনন্দনের উত্তরে সুভাষ একটি ছোট বক্তৃতা দিলে। বক্তৃতা দেবার সুভাষের অপূর্ব ভঙ্গী। তার কথার ভঙ্গী মানুষকে চুম্বকের মতো টেনে ধরে। আজকে ওর বক্তৃতা শুনে মনে হল আমরা যেন নিতান্তই আপন জন—যেন ওর আপন ভাই।

সুভাষের বক্তৃতার পর আমার বলবার পালা। সবাই অনুরোধ করলে সুভাষ সম্বন্ধে আমায় কিছু বলতে হবে। আমি বক্তা নই—তাই কিছু বলতে আমার ইতস্তত হয়। তবু অল্প কিছু বললাম। সুভাষ সম্বন্ধে আমায় কিছু কোনদিন বলতে হবে এ ছিল আমার কল্পনার বাইরে।

* * *

অনুষ্ঠানের পরে সুভাষ এল আমাদের সঙ্গে হোটেল অবধি। আমাদের

হোটেলের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ও চলে গেল। আমি ঘরে বসে কল্পনার জাল বুনতে লাগলাম।

আমি ভাবতে থাকি কী কারণে এদেশে সুভাষ এসেছে। আর আমাকে ওর কিসের প্রয়োজন। ভেবে আমার সমস্যার কোন সমাধান হয় না। হয়তো এই সব কিছুর পেছনে কোন রহস্য লুকানো আছে। কী সে রহস্য?

জানবার তৃষ্ণা মানুষকে পাগল করে তোলে। আজ এত সব গুপ্ত রহস্য জানবার জন্যে আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। ঠিক করলাম শিগগিরই এই নিয়ে সুভাষের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করতে হবে।

বারো

পরদিন ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস। কল্পনার চোখে আমি দেখতে পাই যেন আমার দেশের ঘরে ঘরে উড়ছে স্বাধীনতার ঝাণ্ডা—আমার কানে ভেসে আসে অসংখ্য ভারতীয় নাগরিকের মুক্তির ডাক—বন্দেমাতরম্।

আমরা যে কয়েকজনা ভারতীয় বার্লিনে ছিলাম সবাই গিয়ে কাইসাহফ হোটেলে জড়ো হলাম। জার্মান নাগরিকেরাও আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিল—ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, সরকারী কর্মচারী, সমাজের নামকরা সবাই। এদের দেখে আমার বুঝতে অসুবিধে হয় না যে আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধুমাত্র আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর ছোঁয়াচ জার্মান সমাজেও এসে লেগেছে। কী কারণে এরা আমাদের সাথে হাত মিলিয়েছে আমি জানি নে। এতদিন জানতাম যে ভারতবর্ষ ছিল এ দেশে বিস্ময়ের বস্তু—যেন আরব্য-উপন্যাসের নগরী। সাপ, সাধু আর বাঘের দেশ। ভারতীয় স্বাধীনতা এদের মধ্যে কোন সাড়া তুলতে পারে এ ধারণা আমার ছিল না কিন্তু আজকের জনতা দেখে আমার সে ভুল ধারণা ভাঙল।

*　　　　*　　　　*

দুদিন বাদে একদিন নিরিবিলিতে সুভাষের সাথে আমার বিস্তৃত আলোচনা হল। সুভাষ বললে, তার দেশ থেকে পালাবার কাহিনী। সে কাহিনী লোমহর্ষক ডিটেকটিভ উপন্যাসের চাইতে চমকপ্রদ।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে বুদ্ধিতে পরাজিত করেছিলেন ছত্রপতি শিবাজী। তার ফাঁদ থেকে পালিয়ে গিয়ে নাজেহাল করেছিলেন আলমগীরকে। তেমনি সুভাষও করেছিল ইংরেজ সরকারকে নাস্তানাবুদ।

কলকাতার এলগিন রোডের বসতবাটিতে সুভাষ তখন নজরবন্দী। বাড়ির চারপাশে ইংরেজের গুপ্তচরেরা তৎপর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের তীক্ষ্ণ নজর, কে যায়, কে আসে।

তখন কলকাতায় আছেন ইতালির কনসাল স্কারপা। সুভাষের সঙ্গে তার বিশেষ বন্ধুত্ব। সুভাষ তারই সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলে। তারপর একদিন ছদ্মবেশ পরে পুলিশের চোখের সামনে দিয়ে নির্ভয়ে বেরিয়ে গেল। চেনবার উপায় নেই। কলকাতা থেকে সুভাষ এল আফগানিস্থানে জিয়াউদ্দিন ছদ্ম নামে। সেখান থেকে তেহরানে। তারপর রোমে। সেখানে এসে সুভাষ দেখা করলে ইতালির পররাষ্ট্র-সচিব কাউণ্ট চিয়ানোর সাথে। কিন্তু কাউণ্ট চিয়ানোকে দেখে সুভাষ খুশি নয়। এমনি সময় একদিন সুভাষের জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের চাঁই এডাম ফন ট্রটের সাথে পরিচয়।

বহুদিন ধরে ফন ট্রটের গোপন ইচ্ছে যে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরো তীব্র করে তুলতে হবে। কিন্তু এই আন্দোলন চালাবার ভার কাকে দেয়া যায় এই তার ভাবনা। এমনি সময় একদিন বোমে সুভাষের সাথে তার দেখা। সুভাষের বেশের তখন অদল-বদল হয়েছে, নামের হয়েছে পরিবর্তন।—ওরলাণ্ডো মাজোটা।

ফন ট্রটের অনুরোধে সুভাষ চলল বার্লিনে। এখানে প্রথম কয়েকটা মাস তাকে বেশ বাধা-বিপত্তির ভেতর দিয়ে কাটাতে হল। জার্মান সরকারের দৃঢ় বিশ্বাস যে সুভাষ হল ইংরেজদের গুপ্তচর। প্রতিদিনই তার কাছে পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে লোক যায় তার আসল মতবলবটা কী জানবার জন্যে।

বার্লিনের পটসডাম প্লাটজে হোটেল এসপ্লানেড। সেইখানে সুভাষ বসে বসে দিন কাটায়। তাকে সাহায্য করার জন্যে জার্মান সরকার এক সেক্রেটারি দিলেন। ভদ্রমহিলা চমৎকার ইংরেজী বলেন—কথায়, কাজকর্মে চতুর। তার নাম ফ্রয়লাইন সেন্‌খেল।

এরপর সুভাষ তার কাজ শুরু করলে। প্রকাশ পেল তাব মনের গোপন ইচ্ছে। ধীরে ধীরে বাস্তবে পরিণত হল তার মনের কল্পনা আজাদ হিন্দ সংঘ।

জার্মান কর্তাদের কাছে গিয়ে সুভাষ তার মনের কথা খুলে বললে। দেখা করলে ইংরেজ-বিদ্বেষী পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবেনট্রপের সাথে, মোলাকাত করলে প্রোপাগাণ্ডা বিশারদ গোয়েবলসের সঙ্গে।

তখন যুদ্ধপ্রান্তে চলছে জার্মান-বাহিনীর জয়-জয়কার। হিটলার রুশ-বাহিনীর সাথে লড়াইতে ব্যস্ত—ইংরেজের প্রতি নজর দেবার সময় তার নেই, ভারতের স্বাধীনতা তো দূরের কথা। তবু রিবেনট্রপ, গোয়েবলস সুভাষকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এই দূর দেশ থেকে কী করে স্বাধীনতার সংগ্রাম চালানো যায় এইটে হল সুভাষের প্রধান চিন্তা।

প্রথমে কল্পনা ছিল যুদ্ধে জর্মানবাহিনীর জয়লাভ হলে সন্ধির সময় ভারতের স্বাধীনতা প্রশ্নের সমাধান করা। এই কাজের জন্যে তার জার্মানীতে থাকার একান্ত প্রয়োজন।

তারপর শুরু হল রাশিয়ার প্রান্তে লড়াই। দিন কেটে মাস গেল, মাস কেটে বছর। যুদ্ধের বিরাম ঘটার কোন চিহ্ন নেই। এমনি সময় একদিন আমেরিকা ও জাপানে লড়াই বাধল। সুভাষ ঠিক করলে যে, দেশের স্বাধীনতা এই সাগরপার থেকেই করতে হবে। এই কাজের জন্যে ভারতীয় কর্মী চাই, চাই ভারতীয় বেতার কেন্দ্র।

তখন জার্মান প্রচার বিভাগে কাজ করছেন হবিবুর রহমান। নাম্বিয়ার প্যারীর বাসিন্দা, তার পূর্বপরিচিত। সুভাষ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলে। মনের যে স্বপ্ন ছিল এদের সাহায্যে তিনি এবার তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা করলেন। তৈরী হল আজাদ হিন্দ সংঘ, উঠল স্বাধীন ভারতের জয়ধ্বজা।

* * *

সেদিন সুভাষ আমায় বললে : জানো গিরিজা, এ লড়াইতে জার্মানদের দূরদৃষ্টি দেখে আমি অবাক হয়েছি। এদের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। আমার মনে হয় এই লড়াইতে ইংরেজের পরাজয় সুনিশ্চিত।

একটু চুপ করে থেকে সুভাষ বলতে থাকে : আমাদের দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির যথেষ্ট অবনতি হয়েছে। বিশেষ করে আমাদের পক্ষ থেকে। এর কারণ গান্ধীজির দোটানা মন। ইংরেজ আমাদের শত্রু এবং তাদের

দুশমন হচ্ছে আমাদের বন্ধু। তাই জার্মানদের সমর্থন করা হবে আমাদের কাজ।

এবার আমি একটা প্রশ্ন করি। এ প্রশ্নটা বহুদিন থেকে আমার মনের ভেতর ছিল, প্রকাশ করবার অবকাশ পাই নি। জিজ্ঞেস করি : কিন্তু নাৎসীরা কী করে আমাদের বন্ধু হতে পারে। তাদের সাথে নেই আমাদের আদর্শের মিল, নেই কাজের সাদৃশ্য। আমার কথা শুনে সুভাষ হাসে। বলে : ভাই গিরিজা, বন্ধুতা সবার সঙ্গেই করা যায়। আমাদের ব্রত, আমাদের দেশের স্বাধীনতা। আমরা চাই এ আন্দোলনে অন্যের সাহায্য। আমরা তো আর নাৎসীদের পথের কাঁটা নই। তবে আমাদের সাহায্য করতে এদের আপত্তি থাকবে কেন? আচ্ছা ভেবে দেখ না কেন, এই যে ইংরেজ-রুশ মিতালি। ভাবতে পার এটা কি করে সম্ভব হল। ইংরেজ কম্যুনিস্ট বিরোধী, দুই দলের সম্পর্ক অহিনকুল। তবু এরা বিপদের সময় হাত মিলিয়েছে। আশ্চর্যের! তাই নয় কী?

একটানা বলতে বলতে সুভাষের গলা ধরে এসেছিল, এবার একটু সে থামল। তারপর ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। আমি নিস্তব্ধ হয়ে সুভাষের কথাগুলো গিলতে লাগলাম।

একটা জানালার ধারে গিয়ে সুভাষ আবার বলতে লাগল : এমনি ধরনের ক্ষণস্থায়ী বন্দোবস্ত আমরাও নাৎসীদের সঙ্গে করতে পারি। এতে বাধা কিসের? তোমার কথা মানি গিরিজা, নাৎসীদের সাথে আমাদের আদর্শের মিল নেই, নেই কর্মপন্থার সাদৃশ্য। কিন্তু ওরা যদি আমাদের সাহায্য করে, মেনে নেয় আমাদের আদর্শ, তবে এদের সঙ্গে হাত মেলাতে আপত্তি কিসের?

সুভাষ বলে : আজকে আজাদ হিন্দের জন্যে আমাদের অনেক কিছুর প্রয়োজন। চাই অর্থবল, চাই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। আমরা ভারতীয়, আমাদের লক্ষ্য হবে শুধু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জোরালো করে তোলা। জার্মানদের পক্ষে বা বিপক্ষে আমরা কিছুই বলব না। ইউরোপে এদের লড়াইর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

সুভাষের কথা শুনে আমি চুপ করে থাকি। একটু বাদে সুভাষ বলে, জানি গিরিজা, তুমি কী ভাবছ। তোমার আদর্শকে তুমি বিসর্জন দিতে চাও না। কিন্তু ইতিহাসের কথা ভেবে দেখো, এ ধরনের বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত আছে তো সহস্র। বহুবার বিভিন্ন আদর্শবাদী রাষ্ট্র শুধু নিজের স্বার্থের জন্যে পরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আমরাও তাই করব।

আমি ভাবি, সত্যিই তো, ইতিহাসের প্রথম থেকে মানুষ দেখেছে তার নিজের স্বার্থকে। তাকে বজায় রাখতে তারা মিত্রকে করেছে শত্রু আর শত্রুকে করেছে বন্ধু। আজ আমার কর্তব্য দেশের স্বার্থকে দেখা। তবে এ কাজ করতে কুণ্ঠা কেন? মনের ভেতর যে সংশয়, দ্বিধা ছিল, আজ সুভাষের কথা শুনে দূর হয়ে গেল।

আমি এবার একটু আস্তে আস্তে জবাব দিলাম: আমি প্রস্তুত। আমি হব আজাদ সৈনিক।

আমার কথা শুনে সুভাষের মুখ হাসিতে ভরে ওঠে। জানলার ভেতর দিয়ে বাইরের পানে তাকায়। দিনটা ছিল পরিষ্কার, সোনালী আলোয় ভর্তি। পট্‌সডাম প্লাটন, লোকারণ্য, পৃথিবীর কোলাহল এখানে এসে কোন চাঞ্চল্য ঘটায় নি। সুভাষ ধীরে ধীরে বলে: আমি জানতাম, তুমি মানবে আমার কথা। জান, আজ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে স্বপনপুরীর দেশ সে হল আমার সোনার দেশ, সোনার ভারতবর্ষ। আমি দেখতে পাচ্ছি আজ থেকে বহু বর্ষ পরে সে দেশ হবে সুজলা, সুফলা শস্যশ্যামলা ভারত। ঐ দেশের বুকে উঠবে স্বাধীনতার জয়ধ্বজা, সবার কণ্ঠে শুনতে পাব স্বাধীনতার গান। দূর হবে আমার দেশের গ্লানি, তার দৈন্য। সবার সাথে আমরা এগিয়ে যাব একতালে।

তারপর আমার পানে তাকিয়ে বলল—গিরিজা, আমার সমস্ত অস্থিমজ্জার সঙ্গে আমার দেশ মিশে আছে। দেশ আমার স্বপ্ন, দেশ আমার ধ্যান। তাঁকে আমি চিনি তাকে আমার আবিষ্কার করতে হয় নি।

আমি চুপ করে রইলাম। এরপর আর গোটাকতেক মামুলী কথা বলে সেদিনকার মত আমি চলে এলাম।

সেদিন থেকে আমি নবজন্মে দীক্ষিত হলাম।

আমি হলাম আজাদ হিন্দ সংঘের এক কর্মী।

*　　　　*　　　　*

কয়েকদিন বাদে স্থভাষ আমাদের লাঞ্চে নেমন্তন্ন করলে। সেদিন খাবার টেবিলে বসে এডাম ফন ট্রটের সাথে পরিচয় হল। সেদিন আমি সর্বপ্রথম জানতে পারলাম যে আজাদ হিন্দ সংঘ গঠনের পেছনে এর হাত ছিল—ছিল প্রেরণা।

ভারত নিয়ে ফনট্রটের আগ্রহ বহুদিনকার। ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রথম আভাস তিনি পান অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন। সেইখানে তাঁর পরিচয় হয় হুমায়ুন কবিরের সাথে। কবির যখন তরুণ, দেশ-প্রেমে অন্ধ! ফনট্রট কবিরকে দেখে মুগ্ধ হলেন। সেদিন থেকে জানবার আগ্রহ হল ভারতবর্ষকে আর ভারতীয়কে।

স্থভাষ যখন রোম থেকে বার্লিনে তখন তাকে বিস্তর বাধা পেতে হয়েছিল। ফন ট্রটের জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরে ছিল বিস্তর প্রতিপত্তি। তারই মারফত স্থভাষ জার্মান সরকারের কাছ থেকে সাহায্য পেলেন। ফনট্রট তাকে নিয়ে গেলেন বিবেনট্রপের কাছে গোয়েবলসের দপ্তরে।

এডাম ফন ট্রট ছিলেন উদারপন্থী গান্ধীজির ভক্ত। এ আলাপের বহুদিন বাদে আমি গান্ধীজিকে নিয়ে জার্মান কগজে এক প্রবন্ধ লিখেছিলাম। প্রবন্ধ প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে এডাম ফন ট্রট টেলিফোন করে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

নাৎসীদলের সাথে তাঁর কোন মনের মিল ছিল না। তাই হিটলারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বহুদিন বাদে যখন এই আন্দোলন প্রকাশ হয়ে যায় তখন ফন ট্রটকে নাৎসীদের হাতে প্রাণ দিতে হল।

*　　　　*　　　　*

নতুন প্রেরণা নিয়ে আমাদের আজাদ হিন্দ সংঘের কাজ শুরু হল।

বার্লিনে তিয়ারগার্ত এলাকায় বসল স্থভাষের দপ্তর। আমরা গিয়ে সবাই

সে দপ্তরে কাজ করলাম। আমাদের কাজ হল কী করে আজাদ হিন্দ বেতার প্রতিষ্ঠান চালু করা যায়। এ নিয়ে নানা কল্পনা হল।

এদিকে সুভাষ চরকিবাজির মত দেশের চারদিকে ঘুরছে। আজ পররাষ্ট্র দপ্তর, কাল ভারতীয় বন্দী সৈন্যদের কথা বলে সে বেড়ায়। আজাদ হিন্দ সৈন্যবাহিনী গঠন করা এই হল তার একমাত্র ধ্যান।

ইতিমধ্যে বছর ঘুরে আবার স্বাধীনতা দিবস এল। সেই দিন জন্ম নিল আমাদের সংঘের মুখপত্র 'আজাদ হিন্দ।'

*   *   *

ইতিমধ্যে যুদ্ধের পরিস্থিতির বেশ কিছু অদল বদল হয়েছে। সিঙ্গাপুরের পতন হয়েছে, জাপানী বাহিনী বর্মার দুয়ারে।

ইংরেজ সরকার আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন ভারতের গুরুত্ব বাড়ছে।

সুভাষ বললে: আর দেরি নয়। আজাদ হিন্দ রেডিও শিগগির আমাদের চালু করতে হবে। দেশ-বিদেশের লোকের কাছে জানাতে হবে ভারতের কথা। আর আমার দেশবাসীর কাছে বলতে হবে পশ্চিমের ও পূর্বের দূর পরিস্থিতি।

সুভাষ বোস জার্মানিতে তখনও এ খবরটা সবার অজানা। তাই ঠিক হল এ খবরটা আমাদের সবাইকে জানাতে হবে।

সুভাষ আমায় বললে: ১৯৩০-৩১ দেশে তখন অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ বইছে, ব্রিটিশ সরকার দেশের সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করেছেন এমনি সন্ধিক্ষণ সময়ে দেশবাসীকে সংগ্রামের প্রেরণা যুগিয়েছিল এক গুপ্ত বেতার প্রতিষ্ঠান। সেদিনকার সেই গুপ্ত বেতার প্রতিষ্ঠানের অঙ্কুর থেকেই জন্ম নিয়েছে আজকের আজাদ হিন্দ রেডিও। আমরাও আজ দেশবাসীকে দেব স্বাধীনতার প্রেরণা সংগ্রামের উৎসাহ।

কিছুদিন বাদেই সুভাষের স্বপ্ন সার্থক হল। জন্ম নিল নতুন আকাশবাণী —আজাদ হিন্দ রেডিও।

তের

'আমি সুভাষ বলছি—'

মধুর সঙ্গীতের মত এই তিনটি শব্দ আজও আমার কানে বাজছে।

আজাদ হিন্দ রেডিও'র উদ্বোধন দিবস। আমরা সবাই জড়ো হয়ে সুভাষের বক্তৃতা শুনছি। দেশবাসীর কাছে ভারত থেকে পালাবার পর এই প্রথম বক্তৃতা। তাই আমরা সবাই উত্তেজিত, আগ্রহের সাথে তার বক্তৃতা শুনতে লাগলাম। সেদিনকার বক্তৃতা চিরস্মরণীয়—। তার কণ্ঠস্বর শান্ত গম্ভীর।

"আমি সুভাষ বলছি।"

"বছর ধরে আমি এই সময়ের প্রতীক্ষা করেছি। আশায় বুক বেঁধেছিলাম যে আমার ডাক আসবে, আমি আবার আপনাদের সামনে এসে দাঁড়াব। আজ ডাক পড়েছে, তাই আমি আপনাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।"

সুভাষ বলতে থাকে। ব্রিটীশ সিংহের রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যায় না এই ছিল প্রবাদ বাক্য। আজ সেই সাম্রাজ্যে অস্ত স্তিমিত হয়েছে—তার পশ্চিম গগনে হেলেছে সূর্য্য। নতুন সূর্য্য উদিত হয়েছে স্বাধীন ভারতে।

'আপনারা লড়াইর পরিস্থিতির কথা ভেবে দেখুন। পরাজয়ের প্লাবন সুরু হয়েছে ইংরেজের রাজ্যে। সিঙ্গাপুরের পতন হয়েছে, ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।'

সুভাষ বলে যায়: দেশ আমার স্বাধীন না হওয়া অবধি আমি সংগ্রাম করে যাবো। আমি আপনাকে মুক্ত করবো পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে।

"এই সংগ্রামে আমি চাই আপনাদের সাহায্য—আপনাদের সহায়তা। আপনার রক্তের পরিবর্তে আমি দেব আপনার স্বাধীনতা।'—আপনার মুক্তি।"

সেদিনকার সেই অবিস্মরণীয় বক্তৃতা আমরা কেউ ভুলিনি।

* * *

সুভাষের বক্তৃতার পর ইংরাজীতে বক্তৃতা দিলাম আমি ও শর্মা বলে আর একটি ছেলে।

সুভাষ আরো তিনভাষায় বক্তৃতা করলে। ওর বাংলা বক্তৃতা লেখার দায়িত্ব পড়ল আমার উপর। কাজটা আমার পক্ষে বিশেষ সহজসাধ্য ছিল না। বহুদিন বাংলা ভাষার চর্চার অভাবে, সেদিনকার বক্তৃতা লিখতে আমার বেশ কষ্টই হয়েছিল।

* * *

বেতার প্রচারের কাজে আমরা অনভিজ্ঞ তবু আমাদের কাজে উৎসাহের অভাব নেই। সকাল-সন্ধ্যা খাটুনি আর নতুন কর্মপন্থা নিয়ে ব্যস্ত থাকি।

সুভাষ বলে: দেশে আজকাল বিদেশী বেতারের প্রচার বেড়েছে। একদিন না একদিন কেউ না কেউ আমাদের আজাদ হিন্দের অস্তিত্বের কথা জানতে পারবেই। একজনা জানলে দেশের দশজনা জানতে পারবে আজাদ হিন্দের কাহিনী।

মিথ্যে অনুমান করেনি সুভাষ।

কয়েক মাসের মধ্যেই আমাদের আজাদ হিন্দ রেডিও জনপ্রিয় বেতার প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়াল।

এদিকে আমাদের কাজের অসুবিধের অন্ত নেই। আমাদের কাজের জন্যে জার্মান রেডিও কর্তৃপক্ষ প্রোগ্রামের একটা সময় নির্দিষ্ট করে দিলে। নির্দিষ্ট হল ওয়েভলেংথ। কাজের সুবিধের জন্যে আমরা আগে থেকেই প্রোগ্রাম রেকর্ড করে রাখতাম। ভারতীয় সংবাদের জন্যে আমাদের দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সংবাদের উপর নির্ভর করতে হত। তার কারণ জার্মান সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের কাছে ভারতীয় সংবাদ মিলত না বললেই চলে।

* * *

কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা কাজে বেশ দক্ষ হয়ে উঠলাম। প্রথমটায়

কাজের ভাগাভাগি নিয়ে একটু অসুবিধে হয়ে ছিল বটে কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আমরা আমাদের দোষত্রুটী ধরতে পারলাম। দক্ষ বক্তা ও দক্ষ নিউজ এডিটার বেছে নিতে কোন অসুবিধে হল না।

ইতিমধ্যে ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিরও দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে। রেঙ্গুনে উড়ছে জাপানীর জয়ধ্বজা—ভারতীয় সীমান্তের অল্প কিছুদূরে পড়েছে জাপানী সৈন্যবাহিনীর ছাউনী। আতংকিত হয়ে ভারতীয় নেতাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এলেন ইংরেজ মন্ত্রী ক্রীপস।

*　　　*　　　*

অবস্থার গুরুত্ব দেখে আবার সুভাষ এল আজাদ হিন্দ রেডিওতে বক্তৃতা দিতে।

সেদিনকার বক্তৃতায় সুভাষ ক্রীপসকে উদ্দেশ্য করে এক চিঠি পড়লে।

সুভাষ বললে : ক্রীপস হলো চার্চিলের কলের পুতুল। নিজের ইচ্ছায় কোন কিছু করার ক্ষমতাই তার নেই। হ্যাঁ কি না দুটো কথা বলার জন্যেই তাকে লণ্ডনের মুখের পানে চেয়ে থাকতে হয়। সেখানকার নেতাদের বিনানুমতিতে তার কিছু করবার যো নেই। আমার ভারতীয় বন্ধু, আপনাদের কাছে এই আমার একান্ত অনুরোধ যে ক্রীপসের ভাঁওতায় আপনারা ভুলবেন না। আমাদের একমাত্র দাবী পূর্ণ স্বাধীনতা। স্বাধীনতা বিনা আমরা বাঁচতে চাইনে।

সুভাষের বক্তৃতা সেদিন আমাদের সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। তার বলার ভঙ্গী, কণ্ঠস্বর আমাদের মনে যে রেখাপাত করেছিল তা কোনদিন ভুলবার নয়।

এর পর থেকে আমরা আমাদের প্রোগ্রামে ক্রীপস প্রস্তাবের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে সুরু করলাম। দেশবাসীকে জানালাম যে এ প্রস্তাবের গলদ কোথায়। গলদ বোঝাবার জন্যে আমাদের এ প্রস্তাবটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে বিচার করতে হল।

কয়েকদিন বাদে ক্রীপস ব্যর্থ হয়ে দেশে ফিরে গেলেন। আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। মনে হল আমাদের প্রচার সার্থক হয়েছে।

*　　　　*　　　　*

ইতিমধ্যে আমাদের দল বেশ ভারী হতে লাগল।

আমাদের কাজে এসে যোগ দিল প্রমোদ সেন, বিষ্ণু ব্যানার্জি। তারা এতদিনে প্যারীতে গা ঢাকা দিয়েছিল। আজাদ হিন্দ রেডিওর কাজ সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল।

নতুন কর্মী আসা মানেই নতুন সমস্যা। বিষ্ণু ব্যানার্জি আর প্রমোদ সেন চিন্তাধারায় বামপন্থী—ন্যাশনাল সোসালিজমের ঘোরতর বিরোধী। অতএব নাৎসী চিন্তাধারার সঙ্গে কী করে হাত মেলান যায় সেইটে হল আমাদের সমস্যা। ইংরেজের চক্রে নাৎসী আমাদের বন্ধু, এটা আমরা মেনে নিয়েছি সত্য কিন্তু নাৎসীদের কর্মপন্থার সঙ্গে আমাদের কোন সাদৃশ্য নেই। অতএব অনেক আলোচনা, তর্কের পর ঠিক হল যে আমরা শুধু ভারতীয় সমস্যাই আজাদ হিন্দ রেডিওতে প্রচার করব—জার্মান রাজনীতি বা নাৎসী কর্মপন্থা আমাদের প্রোগ্রামে স্থান পাবে না। এছাড়া লড়াইর পরিস্থিতি দেখে আমাদের জার্মান সৈন্যবাহিনীর জয়লাভ সম্বন্ধে ক্রমেই ঘোরতর সন্দেহ হচ্ছিল।

আমাদের মত সুভাষও দোটানায় পড়েছিল। নাৎসী নীতির সঙ্গে তার মতের কোন মিল নেই। চিন্তাধারা তার বইছে ভিন্ন স্রোতে। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতা—যতোদূর সম্ভব নাৎসী কর্মপন্থার থেকে দূরে সরে থাকা।

সুভাষ হয়ত আমাদের মনের কথা বুঝতে পারে। একদিন বললে : উপায় নেই ভাই। আজ ফেরবার পথ নেই—এগোবার আছে। আমার স্বপ্ন, আমার ধ্যান হলো আমার দেশ, এক স্বাধীন দেশ, যার স্থান হবে পৃথিবীর স্বাধীন জাতির ভেতর। আমাদের কাছে সময় বেশী নেই কিন্তু হাতে কাজ আছে প্রচুর। তার জন্যে আমাদের একমনে, এক চিন্তাধারায় কাজ করতে হবে। এর জন্যে যদি জীবন উৎসর্গ করতে হয়, তার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। লড়াইর পর যেন আমার দেশবাসীরা জানতে পারে যে আমরা এক মুষ্টিমেয় ভারতীয়, আমরা ভালোবেসেছিলাম

আমাদের মাতৃভূমিকে। তাঁকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্যে আমরা প্রাণ দিয়েছি।

বলতে বলতে সুভাষ থামে। তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার বলতে থাকে: আমাদের হবে দুটো কাজ। আমাদের দেশের কাগজগুলোর আজ মুখ বন্ধ। কোন স্বাধীন মত প্রকাশ করার উপায় আজ তাদের নেই। তাই আমাদের প্রথম কাজ হবে দেশবাসীকে জানান আজাদ হিন্দ সংঘের কর্মধারা। বলতে হবে তাদের পশ্চিমের লড়াইর কাহিনী—ইংরেজের পরাজয়ের ঘটনা। দ্বিতীয়তঃ আমরা জানাব ইউরোপীয়দের, তাদের নেতাদের, ভারতের গৌরবের কথা। তাদের বলব যে আমরা শুধু স্বাধীনতা পাবার উপযুক্ত নই, স্বাধীনতা আমাদের প্রাপ্য হয়েছে বহুদিন থেকে। আমাদের দাবী আমরা পূরণ করব।

সুভাষ জানত যে এই সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পার থেকে দেশের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করা বেশ কঠিন কাজ। এ কাজ করতে হলে তাকে যেতে হবে দেশের মাটীর কাছে। সে কী করে সম্ভব?

ভাবনায় পড়ে সুভাষ।

ইতিমধ্যে বর্মায় জাপানী সৈন্যবাহিনী পাকাপোক্তভাবে ছাউনী গেড়ে বসেছে।

সুভাষ ভাবলে: একবার ঐ অঞ্চলে যেতে পারলে আজাদ হিন্দের কাজের অনেক সুবিধে হবে।

তাই সুভাষ পূর্ব এশিয়ায় যাবার আয়োজন সুরু করলে।

*　　　*　　　*

চোদ্দ

যাদের নিয়ে কাজ এবার তাদের কথা একটুকু বলা যাক্। অর্থাৎ যে জার্মান সরকার আমাদের সাহায্য করেছিলেন তাদের কাহিনী।

এ কাহিনী বলার আগে একটু পুরানো ইতিহাস ঝালিয়ে নেয়া দরকার। নাৎসী দলের উত্থান, তার আভাষ আগেই দিয়েছি। কিন্তু যারা ছিলেন এ দলের নেতা, তাদের কথা কিছু বলা হয়নি—অর্থাৎ গোয়েরিং, গোয়েবল্স, হিমলারের কথা।

হিটলার ক্ষমতা পাবার পর যে সব নাৎসী নেতারা তাকে ঘিরে ছিলেন তার মধ্যে গোয়েরিং ছিলেন সর্বপ্রধান। তার প্রথম কারণ তিনি হিটলারের দুর্দিনের সাথী, তার প্রথম জীবনের সংগ্রামের পরামর্শদাতা। পুরানো বন্ধুদের মধ্যে রোয়েম, স্টেথার, হিটলারের চক্রান্তে প্রাণ হারিয়েছেন। ফ্রিক্ও প্রায় ক্ষমতাহীন। থাকবার মধ্যে আছেন একমাত্র গোয়েরিং।

হিটলারের সঙ্গে সঙ্গে গোয়েরিংও পেলেন প্রচুর ক্ষমতা, বহু উচ্চপদস্থ পদ। কিন্তু এই ক্ষমতা পাবার পর তিনি হারালেন তার কর্মদক্ষতা, হলেন বিলাসী, আরামপ্রিয়। মনিমুক্তো, জহরৎ আর দুষ্প্রাপ্য ছবি সংগ্রহ হল তার বাই।

গোয়েরিংএর চরিত্রের এই পরিবর্তন হিটলারের নজর এড়ায়নি। বিশেষ করে হিটলারের পরামর্শদাতা, নাৎসীদলের সেক্রেটারী বোরম্যান ছিলেন গোয়েরিংয়ের ঘোরতর শত্রু। সুবিধে বুঝলেই তিনি গোয়েরিংএর নামে হিটলারের কাছে নালিশ করতেন।

গোয়েরিংএর ভাগ্যতারকা যখন অস্তাচলের পথে তখন গোয়েবলস রাইখ মার্শাল গোয়েরিংকে সতর্ক করলেন। বোরম্যানের প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়ছে। এখন থেকে সতর্ক না হলে পরে তাকে বিস্তর বেগ পেতে হবে।

গোয়েরিং কিন্তু গোয়েবলসের কথা শোনেন আর হাসেন। নিজের ক্ষমতা

সম্বন্ধে তার কোন সন্দেহ নেই। একদিন এই নিয়ে গোয়েবলস, স্পিয়ার, লে, ফুঙ্কের সঙ্গে তার তুমুল তর্ক হয়ে গেলো। কিন্তু গোয়েবলসের সতর্কবাণী গোয়েরিংএর কাণে গেলো না।

ইতিমধ্যে গোয়েরিংএর প্রতিপত্তি কমতে সুরু করল। হিটলার সংকল্প করেছিলেন যে জার্মান বিমান বাহিনী দিয়ে তিনি ইংল্যাণ্ড ধ্বংস করে দেবেন। মাস কেটে বছর গেল—কিন্তু তিনি তার সংকল্প বাস্তবে পরিণত করতে পারলেন না। লণ্ডন আক্রমণ করতে গিয়ে প্রতিদিন তিনি বিস্তর জার্মান প্লেন খোয়াতে লাগলেন। বোরম্যান হিটলারকে বোঝান যে, এই ব্যর্থতার জন্যে গোয়েরিং দায়ী। তিনি হলেন জার্মান বিমানবাহিনীর হর্ত্তা-কর্তা। তার অকর্মণ্যতার জন্যই আজ জার্মান বিমান বাহিনীকে ইংরেজের কাছে হার স্বীকার করতে হচ্ছে। একদিন এই নিয়ে প্রকাশ্যে হিটলার গোয়েরিংকে অপমান করলেন। গোয়েরিংও বেগতিক দেখে হিটলারকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন।

* * *

প্রোপাগাণ্ডার ইতিহাসে জোসেফ গোয়েবলসের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কী করে জনতাকে আকৃষ্ট করতে হয়, এ বিষয়ে তিনি ছিলেন পারদর্শী। নাৎসী দলের প্রতিপত্তি তারই প্রচারে বেড়েছিল।

গোয়েবলস ছিলেন স্পষ্ট বক্তা। এর জন্যে তাকে রাজনৈতিক জীবনে বহু বেগ পেতে হয়েছিল। এমন কি যুদ্ধের প্রারম্ভে হিটলারও তার প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন কিন্তু যতোই গোয়েরিংএর ক্ষমতা লোপ পেতে লাগল—গোয়েবলসের ভাগ্যের তারকা উঠতে লাগল।

যুদ্ধের মাঝামাঝি সময় ইংরেজের বোমায় বার্লিন শহর প্রায় ধ্বংসের পথে, তখন গোয়েবলস সাহস করে এই সব বোমাবিধ্বস্ত জায়গা পরিদর্শন করতেন। এরপর তার জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগল। গোয়েবলস যখন বুঝতে পারলেন যে গোয়েরিং নিস্তেজ হয়ে পড়েছে—তখন তিনি তাকে কর্মদক্ষ করে তোলবার

চেষ্টা করলেন। তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হল। বেগতিক দেখে গোয়েবলস হিমলার, বোরম্যানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন।

১৯৪৩ সাল। যুদ্ধ যখন পুরোদমে চলছে তখন গোয়েবলস আঁচ করলেন যে এ যুদ্ধে জার্মানদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে তিনি হিটলারের কাছে গেলেন। কিন্তু হিটলার গোয়েবলসের প্রস্তাব কানে তুললেন না। বাধ্য হয়ে গোয়েবলস তার ভাগ্যকে হাসিমুখে বরণ করে নিলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন—যে তার মৃত্যু অনিবার্য। সেদিন থেকে তিনি কঠোর পন্থা অবলম্বন করলেন।

লড়াইর শেষদিন অবধি তিনি বার্লিন শহরে ছিলেন। হিটলার আত্মহত্যা করার পর তিনি নিজে আত্মহত্যা করলেন—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে গুলী করে করে মারলেন তার নিজের পাঁচটি ছেলে আর স্ত্রীকে।

* * *

নাৎসী নেতাদের মধ্যে আর একজনের নাম উল্লেখযোগ্য—তিনি হলেন হাইনরিখ হিমলার।

জীবনের প্রারম্ভে তিনি ছিলেন সামান্য স্কুল শিক্ষক। কিন্তু কর্মদক্ষতার দরুন তিনি ক্রমে ক্রমে নাৎসী দলের একজন চাঁই হলেন—হলেন হিটলারের বিশ্বাসী অনুচর। কোন কাজেই তার ক্লান্তি নেই—সকাল সাতটা থেকে ভোর তিনটে অবধি তিনি কাজ নিয়ে মেতে থাকতেন।

তাঁর কাজ নিয়ে কেউ যদি কখনও কোন মন্তব্য করত তখন তিনি হেসে জবাব দিতেন : আমি কতোখানি ঘুমিয়েছি, কতটুকু আরাম করেছি তার হিসেব নিকেষ কখনই ইতিহাস করবে না। কিন্তু এই দুর্দ্দিনে আমি কি করতে পেরেছি, আমার সফলতা—তারই হবে চুলচেরা বিচার। লড়াই যদি জিততে পারি তাহলে ঘুমুবার, আরাম করবার প্রচুর সময় পাওয়া যাবে। আজকের দিনে জার্মানির প্রয়োজন শুধু কাজ—কথা নয়।

হিমলারের জীবনের একমাত্র সংকল্প ছিল রিক্ত অবস্থায় মরতে পারা।

ঐশ্বর্য্যকে তিনি ঘৃণা করতেন। নিজের মাইনে ছাড়া তার কোন রোজগার ছিল না।

হিমলারের ডাক্তার কেরসটেন একদিন তাকে একটি ঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন।

হেসে হিমলার প্রশ্ন করেছিলেন—ঘড়ির দাম কতো?

দেড়শো মার্ক? জবাব দেয়।

পঞ্চাশ মার্ক দিয়ে বললেন: বাকি একশো মার্ক, আগামী মাসের মাইনে পেয়ে দেবো। রাজী?

এই সততার জন্যে হিমলার গঠন করতে পেরেছিলেন তার এস, এস, বাহিনী।

*　　　*　　　*

হিমলারের সাথে কেউ দেখা করতে চাইলে তিনি নিরাশ করেন নি। মেয়েদের প্রতি তার ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। তাদের অপমান করলে তিনি রেগে যেতেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের তিনি ভালোবাসতেন।

*　　　*　　　*

কিন্তু তবু হিমলার ছিলেন এক অদ্ভুত হিংস্র চরিত্রের লোক। লড়াইর জন্যে তিনি সহস্র সহস্র অসহায় নাগরিককে খুন করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। কোন অত্যাচারই তিনি অন্যায় বলে মনে করতেন না।

একদিন হিমলার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তার প্রিয় ডাক্তার কেরসটেন এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কথায় কথায় রাজনীতির কথা উঠল। হিমলার বললেন: অদৃষ্টকে কখনও এড়ান যায় না ডাক্তার।

বিস্মিত হয়ে ডাক্তার প্রশ্ন করেন: তার মানে?

গীতা পড়েছ ডাক্তার। পড়োনি? বেশ তোমাকে গীতা থেকে কয়েক লাইন পড়ে শোনাচ্ছি। পড়ে দেখ এই বই—চমৎকার। গীতা হলো আমার বাইবেল।

এই বলে হিমলার গীতা থেকে পড়তে লাগলেন: মানুষ যখন সত্যর প্রতি

শ্রদ্ধা হারায়। এ সংসারে যখন আসবে অরাজকতা তখন আমার আবার পুনর্জন্ম হবে—

বলতে বলতে হিমলার হাসেন। তারপর বলেন : এ হলো ভগবান কৃষ্ণের কথা। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে বলেছিলেন। এই কয়েকটি কথা ফ্যুরার—আমার নেতা হিটলারের জন্যেই লেখা। যুগে যুগে আমরা এমনি নেতা পেয়েছি। গ্যয়টকে পেয়েছিলাম আমাদের সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ইন্টেলেকচুয়াল ক্ষেত্রে। বিসমার্ক দেখা দিয়েছিলেন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, আর হিটলার—দেখা দিয়েছেন সবার ক্ষেত্রে।

হিন্দুধর্মের প্রতি হিমলারের ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। গীতা ছিল কণ্ঠস্থ।

এ কথা শুনেছিলাম সুভাষের কাছে।

আমরা যখন আজাদ হিন্দ সংঘ গঠন করতে ব্যস্ত, তখন আমাদের পেছনে জার্মান ফেউ লেগে আছে। তাদের নজর এড়িয়ে কোন কাজ করবার যো নেই। সুভাষের অবর্তমানে তার ঘর দৈনন্দিন খানাতল্লাসী হতো। এ ছাড়া সুভাষ তখন এশিয়া প্রান্তে চলে যাবার সংকল্প করেছে। যাবার আগে জার্মানে অবস্থিত ভারতীয়দের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে হিমলারের কাছে গেল।

হিমলারের সাথে সুভাষের প্রায় দু ঘণ্টা আলাপ হলো। আলাপের প্রধান বস্তু ছিল ভারতীয় ঐতিহ্য, মহেঞ্জোদরোর সভ্যতা ও গীতার আদর্শ।

বাইরে এসে সুভাষ আমাদের বললে : জানো যে লোকটার ভারতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতার প্রতি অগাধ জ্ঞান। এ বিষয় নিয়ে আমায় হাজার হাজার প্রশ্ন করেছে। সত্যি বলতে কী ওর জ্ঞান দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।

আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করি : আমাদের সম্বন্ধে কী বন্দোবস্ত হলো। মানে এই তুমি এশিয়া প্রান্তে চলে গেলে পর, আমাদের যাতে জার্মান পুলিশের হাতে নাস্তানাবুদ না হতে হয়।

সুভাষ হেসে জবাব দেয়: হ্যাঁ, কথা দিয়েছে হিমলার যে তোমাদের প্রতি কোন অত্যাচার, অন্যায় বা অবিচার করা হবে না।

হিমলার এ প্রতিশ্রুতির খেলাপ করে নি।

সুভাষ জার্মানি ছেড়ে চলে যাবার পর আমাদের কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয় নি।

*　　　　*　　　　*

গোয়েরিং, হেস প্রভৃতি নেতাদের ভাগ্য তারকা যখন অস্তাচলের পথে, তখন এক অখ্যাত নাৎসী নেতা হিটলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি হলেন মার্টিন বোরম্যান।

১৯৪২ সাল, চতুর্দিকে তখন হিটলারের জয় জয়কার।

মে মাসের এক বিকেলে, নাৎসী দলের সেক্রেটারী রডলফ হেস সবার অজ্ঞাতসারে আর্ডসবার্গ এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনে করে স্কটল্যাণ্ডের পানে রওনা দিলেন। যাবার কারণ আর কিছুই নয়, চমকপ্রদ একটা কিছু করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়া। বছরখানেক যাবৎ হেসের প্রতিপত্তি কমে আসছে। একটা আশ্চর্যাজনক কিছু না করলে শিগগিরই তাকে পস্তাতে হবে এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

হেসের দৃঢ় ধারণা যে হিটলার ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ করতে চান না। তার শত্রু রাশিয়া, কম্যুনিজম হলো তার জুজু। অতএব যতো শিগ্‌গির ইংরেজের সাথে আপোষ করা যায় ততোই ভালো। অনেক ভেবে চিন্তে হেস ঠিক করলেন যে তিনি সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে ইংল্যাণ্ডে যাবেন। ১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিক গেমসের সময় তার এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় ইংরেজের সাথে পরিচয় হয়েছিল। তার নাম ডিউক অব হ্যামিলটন। ঠিক করলেন তার মারফৎ তিনি এই সন্ধির প্রস্তাব চালাবেন।

যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। হিটলারকে না জানিয়ে হেস স্কটল্যাণ্ডের পানে রওনা দিলেন।

ইগেলকহ্যাম স্কটল্যাণ্ডের এক ছোট এলাকা। সেইখানে এসে হেস

নামলেন। তারপর সোজা এসে ডিউক অব হ্যামিলটনের সাথে দেখা করলেন। তারই মারফৎ তিনি ইংরেজ প্রধান মন্ত্রী চার্চিলকে জানালেন যে হিটলার ইংরেজের সাথে সন্ধি করতে প্রস্তুত শুধুমাত্র কয়েকটি সর্তে।

তার প্রথম সর্ত যে ইউরোপ হবে জার্মানদের এলাকা,—প্রাক্তন জার্মান উপনিবেশ জার্মানদের ফিরিয়ে দিতে হবে। এর পরিবর্তে হিটলার ইংরেজের বিশাল সাম্রাজ্যকে স্বীকার করে নেবেন। অবশ্যি রাশিয়ার কথা সতন্ত্র কারণ তার সঙ্গে হিটলারকে শিগগিরই একটা বোঝাপড়া করতে হবে।

এই সর্তের সঙ্গে হেস আর একটি সর্ত জুড়ে দিলেন। সে হলো যে হিটলার চার্চিল গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে নারাজ।

হেসের প্রস্তাব শুনে ইংরেজ সরকার হতভম্ব। চতুর্দিকে তখন ইংরেজের পরাজয় হচ্ছে। তাই প্রথমটায় তারা একটু ভাবনায় পড়লে। কিন্তু চার্চিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কোন প্রকাবেই হিটলারের সাথে আপোষ হতে পারে না। অতএব হেসকে স্পষ্ট জানান হলো যে তার কোন সর্তই ইংবাজ সরকার মানতে বাজী ন'ন।

হেসের চেষ্টা ব্যর্থ হলো। বাধ্য হয়ে তাকে ইংবেজের কারাগারে আশ্রয় নিতে হলো।

*　　　　*　　　　*

হেসের ইংল্যাণ্ড পালিয়ে যাবাব কাহিনী যেমনি ইংল্যাণ্ডে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কবেছিল, তেমনি জার্মান নেতাদেব মধ্যে আলোড়ন এনেছিল। হিটলার হেসের সংকল্পেব কিছুই জানতেন না। যখন তিনি শুনতে পেলেম যে হেস সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে ইংল্যাণ্ডে গেছেন তখন তিনি তেলে বেগুনে চটে গেলেন।

ইংরেজের সাথে সন্ধি এ অসম্ভব। 'আর দুদিন বাদে আমি রাশিয়া আক্রমন করতে যাচ্ছি। এ সময়ে মীমাংসার কোন কথাই উঠতে পারে না'।

হিটলার হুকুম দিলেন যে হেস দেশে ফিরে এলে তাকে গুলী করে মেরে ফেলা হবে।

হেসের দেশে ফিরে আসার সৌভাগ্য হয় নি। পুরো লড়াইটা তাকে ইংরেজের বন্দী হয়ে কাটাতে হয়েছিল।

*　　　　*　　　　*

হেস চলে যাবার পর স্বরু হলো মার্টিন বোরম্যানের প্রতিপত্তি। হেস ছিলেন নাৎসী দলের সেক্রেটারী। এবার এ কাজের দায়িত্ব নিলেন বোরম্যান। ক্রমে ক্রমে তিনি হলেন হিটলারের একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর। নাৎসী পার্টি—চালনার সমস্ত ক্ষমতা এলো তার হাতে। তিনি পেলেন অপ্রতিহত ক্ষমতা। কিছুদিন বাদে তিনি হলেন হিটলারের সেক্রেটারী। তাকে ডিঙিয়ে যাবার কোন উপায় নেই।

লড়াইর শেষে তিনি ধ্বংসের হাত থেকে এড়িয়ে বিদেশে গেলেন।

আজ অবধি কেউ জানে না বোরম্যান কোথায়?

*　　　　*　　　　*

পনেরো

বাঙালীর বদনাম দল পাকান। দল পাকিয়ে বাঙালী কখনও সুনাম অর্জন করেনি। কিন্তু সুভাষ এ অপবাদ ঘোচালে।

ইউরোপের চারদিকে আমরা ভারতীয়রা ছড়িয়ে আছি। বিভিন্ন প্রদেশের, বিভিন্ন ভাষাভাষী, পরিচয়হীন, সম্পর্কহীন, উদ্দেশ্যবিহীন আকাশের তারার মতো আমরা সবাই ঘুরে বেড়াই। হঠাৎ ধূমকেতুর মতো সুভাষ এসে দেখা দিল আমাদের মাঝে।

কৌতূহল টেনে আনল সুভাষকে আমাদের কাছে।

দিন কেটে মাস যায়—তারপর বছর। চুম্বকের মতো আমরা সুভাষের কাছে এগিয়ে যাই। কিসের আকর্ষণে কেউ জানি না।

সুভাষ দীক্ষা দিল সবাইকে স্বাধীনতার মন্ত্রে। বলতে শেখাল দেশ আমার স্বাধীন, আমরা হলাম আজাদ হিন্দের নাগরিক। শোনাল 'বন্দেমাতরমের' ধ্বনি। মুষ্টিমেয় ভারতীয়দের সেই ধ্বনি প্রচারিত হল 'আজাদ হিন্দ আকাশবাণীতে'। এক অন্ধকার ভবিষ্যৎ নিয়ে সুভাষ এসেছিল জার্মানীতে। বিদেশ থেকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম করতে পারবে, এ ছিল তার কল্পনায় অতীত। কিন্তু তার কাজের গুনে অন্ধকারের মেঘ কেটে গেল—আমরা সবাই দেখতে পেলাম স্বাধীনতার আলো। জার্মান সরকার স্বীকার করে নিল আমাদের স্বাধীনতার দাবী।

* * *

ইতিমধ্যে পূর্বপ্রান্তে লড়াইয়ের দ্বিতীয় পর্ব সুরু হয়েছে। জাপানের মনে দেখা দিয়েছে ভারত আক্রমণের কল্পনা। জার্মান সরকারও ভেবে দেখল ভারতের গুরুত্ব আর তুচ্ছ করা যায় না। অতএব আমাদের কাজে এরা বিশেষ উৎসাহ নিয়ে সাহায্য করতে লাগল।

জার্মান সরকারের এই উৎসাহে সুভাষ বিচলিত হয় নি। তার মনের ভেতর ছিল নাৎসী নীতির প্রতি বিতৃষ্ণা। কিন্তু সেই সময়ে বুদ্ধিমানের কাজ হলো চুপ করে থাকা। আপন মনে কাজ করে যাওয়া। তাই সে করলে। জার্মান সরকারের সাহায্যকে উপেক্ষা করলে না। শুধু বললে: আজাদ হিন্দ সংঘ হবে ভারতীয়। শুধু চিন্তায় নয়, কাজেও। জার্মান সরকারের নীতি আর আজাদ হিন্দের নীতি হবে বিভিন্ন। আজাদ হিন্দ সংঘ হবে এক স্বাধীন প্রতিষ্ঠান।

সুভাষের এ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি।

লড়াইর পুরোটা সময় আমরা ছিলাম জার্মান সরকার থেকে পৃথক, নাৎসী দলের থেকে আওঁতা থেকে স্বাধীন।

আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করা।

*　　　*　　　*

আমাদের কাজের ছিল বহু বৈচিত্র্য। সংঘের না ছিল সভাপতি না ছিল সেক্রেটারী। আলোচনার জন্যে বৈঠকের প্রয়োজন হতো না। কারণ সব কাজের মীমাংসা করত সুভাষ। অর্থাৎ কী হবে, কী না হবে। কর্মীদের মধ্যে কোন বিভেদ বা পার্থক্য ছিল না।

দিনের পর দিন আমাদের সংঘের কাজ বাড়তে লাগল। তাই প্রয়োজন হল দ্বিতীয় নেতার। সুভাষ, নাম্বিয়ার ও নরহরি গনপুলেকে এ কাজের দায়িত্ব দিলে।

গনপুলে ছিলেন বোম্বাই কংগ্রেসের এক বিশিষ্ট কর্মী। জার্মান দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে তিনি ছিলেন বিশেষ ওয়াকিবহাল। আর জার্মান ভাষা তো তার মুখে খৈর মতো ফোটে।

কাজ কর্ম নিয়ে মাঝে মাঝে আমরা সুভাষের বাড়ীতে বা হোটেলে জড়ো হতাম। সুভাষ আমাদের পরামর্শ দিতো—কী করতে হবে, কী না।

সুভাষের হাতে ছিল অফুরন্ত কাজ। আজাদ হিন্দ সংঘকে গড়ে তোলা সহজ কাজ নয়। তাই সে চরকি-বাজীর মতো ঘুড়ে বেড়াত ইউরোপের

এদিক-ওদিক। ভারতীয় বন্দী সৈন্যদের সাথে যোগাযোগ রাখা ছিল তার অন্যতম কাজ।

কিছুদিন বাদে সুভাষ ভাবলে ভারতীয় বন্দী সৈন্যদের নিয়ে এক জাতীয় সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। নাম হবে তার আজাদ হিন্দ ফৌজ।

যেমনি ভাবা তেমনি কাজ।

অল্পদিনের মধ্যেই সুভাষের কল্পনা অঙ্কুর নিল। দৈনন্দিন সে বন্দীশিবিরে যেতে লাগল। বন্দীদের সাথে বন্ধুত্ব করলে। তাদের গিয়ে শোনালে স্বাধীনতার বাণী। জাগিয়ে তুললে তাদের ভেতর দেশপ্রেম।

ক্রমে ক্রমে এই বন্দীদের নিয়ে গড়ে উঠল আজাদ হিন্দ ফৌজ। এদের সামরিক শিক্ষা দেবার দায়িত্ব নিল জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ।

৪২ এর শেষভাগে—প্রায় দু হাজার ভারতীয় বন্দী এসে যোগ দিলে আজাদ হিন্দ ফৌজে।

* * *

এমনি কর্ম ব্যস্ততার মধ্যে সুভাষ একদিন গেল হিটলারের সাথে দেখা করতে।

দিনটা স্মরণীয়—২৮শে মে, ১৯৪২।

আজাদ হিন্দ সংঘের ছিল বহু সমস্যা। এই সব দৈনন্দিন সমস্যা আমাদের জীবন প্রায় দুর্বিসহ করে তুলেছিল। এ নিযে প্রায়ই আমাদের জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে ঝগড়া হতো।

হিটলারের সাথে দেখা করার আগে আমাদের এক বৈঠক বসল। আলোচনার বিষয় ছিল কী পোষাক পরে সুভাষ হিটলারের কাছে যাবে। কেউ বা ভারতীয় কেউ বা ইউরোপীয় পোষাকের সপক্ষে রায় দিলেন। শেষ অবধি ইউরোপীয় পোষাকেরই জয় হল।

হিটলারের সাথে সুভাষের মোলাকাতের ফলাফল জানবার জন্যে আমরা উদগ্রীব হয়ে রইলাম। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাদে সুভাষ হোটেলে ফিরে এলো।

প্রথমেই সুভাষ বললে: হিটলারের সাথে আলোচনা অসম্ভব। তর্কতো কল্পনার অতীত। আজকের সাক্ষাতে হিটলার ছিল বক্তা, আমি শ্রোতা।

হিটলার সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলের সীমা নেই, তাই সবাই ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করি, আচ্ছা সুভাষ, লোকটা কী ধরনের?

আমাদের প্রশ্ন শুনে সুভাষ একটু হাসে। তারপর বলে: ইপির ফকীরকে দেখেছ? ছ্যাখোনি। নাম শুনেছ তো বটেই। আমাদের হিটলার হলেন ইপির ফকীরের জার্মান সংস্করণ।

সুভাষের কথায় বুঝতে অসুবিধে হলো না যে সুভাষ হিটলারকে দেখে আকৃষ্ট হয়নি।

সুভাষের হিটলারের সাথে মোলাকাতের কিছু ফলাফল হল। জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তর বা চুনোপুঁটি কর্মচারীরা আমাদের যে উপদ্রব করতেন সেটা বন্ধ হয়ে গেল। এ ছাড়া জার্মান সরকারও আজাদ হিন্দ সংঘকে বিদেশী সরকার বলে স্বীকার করে নিলে এবং আমাদের বিদেশী দূতাবাসের মর্য্যাদা দিলে।

* *

কিছুদিন পরে আমাদের সংঘের ভেতর কালো মেঘ ঘনিয়ে এল।

ব্যাপারটা কিছু নয়, অতি সামান্য। কর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ বিরক্তি প্রকাশ করলেন। তাদের উপেক্ষা করা হচ্ছে। সুভাষের পরেই নাম্বিয়াদের স্থান। কিন্তু তার সাথে সুভাষের আকাশ পাতাল পার্থক্য। বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ নাম্বিয়ারের নেতৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করলে।

কিন্তু আমাদের এই ঝগড়া বিবাদ আমরা কিছুদিনের মধ্যেই ভুলে গেলাম। তার প্রধান কারণ আমাদের কাজ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। দেশের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করতে হলে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। দ্বিতীয়তঃ ইউরোপের লড়াইর পরিস্থিতি।

যুদ্ধের অগ্রগতি দেখে সুভাষ প্রস্তাব করলে আমাদের আর একটা নতুন বেতার স্টেশন খুলতে হবে। আগষ্ট বিপ্লবের পর ভারতের অভ্যন্তরীন অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছিল। স্বাধীনতার চেতনা দেশের চারদিকে, সর্ব সমাজে

হয়েছে। অতএব দেশবাসীকে আরো কঠোর সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত করতে হবে। এ কাজের জন্যেই হবে এ নতুন বেতার কেন্দ্র।

নতুন বেতার ষ্টেশনের নাম হলো 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' বেতার কেন্দ্র। বেতার ঘাঁটির একমাত্র কাজ হলো ভারতীয় সংবাদ পরিবেশন করা। প্রোগামের এমনি আয়োজন করতে হবে যেন কেউ জানতে না পারে যে এই ষ্টেশন দেশের বাইরে থেকে কাজ করছে।

আজাদ হিন্দ রেডিওতে আমরা বহুবার জার্মান সরকারের পক্ষ নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছি। তাই জনসাধারণের মধ্যে ধারণা হয়েছিল যে এই বেতার ষ্টেশন হলো জার্মান সরকারের। তাই এবার ঠিক হলো ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের বেতার হবে সম্পূর্ণ সতন্ত্র।

সুভাষ আমায় ডেকে বললে : গিরিজা, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস বেতার ঘাটির কাজ তোমায় নিতে হবে।

সুভাষের আদেশ আমি মাথা পেতে নিলাম।

মুখে এ কাজ করতে রাজী হলাম বটে কিন্তু মনে মনে একটু আতঙ্ক হলো। একটা বেতার ষ্টেশন পরিচালনা করা সামান্য কথা নয়। এ কাজের আভাষ আগেই পেয়েছি। বিশেষ করে ভারতীয় সংবাদ সংগ্রহ করা রীতিমতো দুরূহ কাজ। এ কাজের জন্যে দৈহিক পরিশ্রমের চাইতে কল্পনার প্রয়োজন বেশী।

আমার কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন বিক্রম জহুরী, ও সুরেশচন্দ্র (বর্তমান ভারতীয় লোকসভার সদস্য)। তারা এতোদিন প্যারীতে ছিলেন। সুভাষের আহ্বান শুনে তারা বার্লিনে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে এলেন।

*　　　　*　　　　*

বহুদিন ধরেই জিন্না সাহেবের মুস্লিম লীগের কার্য্যধারা আমাদের ভাবনায় ফেলেছিল। বহু স্বাধীনচেতা মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুস্লিম লীগের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়েছিল। সুভাষ বললে, এর একটা বিহিত করা প্রয়োজন।

জিন্নার প্রচারে কেউ যাতে বিভ্রান্ত না হয়, তার জন্যে আমরা প্রচার সুরু

করলাম। এ প্রচারের জন্যে আর একটি নতুন বেতার ষ্টেশন 'আজাদ মুস্লিম রেডিও'—খোলা হলো। এ ষ্টেশন পরিচালনার দায়িত্ব পড়ল সুলতান বলে একটি হায়দ্রাবাদী মুসলমান ছাত্রের উপর। সুলতানের চমৎকার কণ্ঠস্বর, বলার-ভঙ্গী অপূর্ব, মুখে বয়ে চলে তার উর্দুর ঝর্ণাধারা।

কয়েক মাসের মধ্যে আমাদের বেতার প্রতিষ্ঠানের কাজ বেড়ে দ্বিগুন হলো। হিসেব করে দেখা গেল আমরা মোট ছয়টি ভারতীয় ভাষায় প্রোগ্রাম করছি এবং প্রতিদিন আমরা তিনঘণ্টা করে এই প্রোগাম পরিবেশন করছি। আজাদ হিন্দ রেডিও মারফৎ ছয়টি ভাষায়—ইংরেজী, হিন্দুস্থানী, বাংলা, ফার্সী তামিল, তেলেগুতে প্রোগাম প্রচারিত হতো। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল রেডিওতে চারিভাষায়—ইংরেজী, হিন্দুস্থানী, বাংলা, তামিল প্রোগাম হতো, আর আজাদ মুস্লিম রেডিওতে প্রতিদিন পনেরো মিনিট ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যা নিয়ে উর্দুতে আলোচনা হতো।

* *

সংবাদ সংগ্রহের চাইতে সংবাদ পরিবেশনে আনন্দ বেশী। বিশেষ করে সে সংবাদ যদি হয় মিথ্যে। আমরাও সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত হই নি।

জার্মান সংবাদ প্রতিষ্ঠানের খবরে থাকত মামুলী, গতানুগতিক কথা—আমাদের সংবাদে ছিল চাঞ্চল্য। যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করার জন্যে আমরা কান পেতে দিল্লীর আকাশবাণীর সংবাদ শুনতাম। তারপর সেই সংবাদের উপর কল্পনার প্রলেপ দিয়ে পরিবেশন করতাম। তাই প্রতিদিনই আমাদের সংবাদ ও প্রোগাম চিত্তকর্ষক হয়ে উঠতে লাগল।

* * *

আমরা যখন রেডিওর কাজে মত্ত, সুভাষ তখন আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনে ব্যস্ত। দেশের স্বাধীনতা আনতে হবে—এ কাজে এই ফৌজ হবে অগ্রদূত। এই সৈন্যবাহিনী নিয়ে দেশের মাটীতে ইংরেজের সাথে লড়াই করতে হবে, এই ছিল সুভাষের স্বপ্ন।

ইতিমধ্যে পূর্বপ্রান্তে লড়াইর বহু পরিবর্তন হয়েছে। রেঙ্গুন জাপানীদের

হাতে। এবারে কল্পনা জল্পনা চলছে কী করে ভারতের পানে এগোন যায়। সেই প্রান্তে ভারতীয় সংঘের নেতা রাসবিহারী বোস। জাপান সরকারের ইচ্ছে যে এই ভারতীয় সংঘকে আরো কর্মতৎপর করে তুলতে হবে।

তাই একদিন জাপান থেকে রাসবিহারী বোস সুভাষকে এই সংঘ পুনর্গঠন করে তোলবার জন্যে আহ্বান জানালেন।

রাসবিহারী বোসের আবেদন সুভাষকে ব্যাকুল করে তুললে। বলে: গিরিজা দেশের মাটীই আমার প্রাণ। ভারতীয়দের মাঝে কাজ করে আমি আনন্দ পাই।

ভুল বলে নি সুভাষ। দিনের পর দিন আমি তাকে লক্ষ্য করেছি ভারতীয় বন্দীদের সাথে কথা বলতে। শুনেছি তার মমতা মাখান বাণী।

একদিনের কথা আমার আজো মনে আছে। ড্রেসডেনে, রৌদ্রক্লান্ত দিনের শেষে সুভাষ কিছু ভারতীয় নাবিকদের সাথে কথা বলছিল। আমরা সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলাম। শ্রোতাদের অধিকাংশই ছিল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের—নানা জাতের, নানা ধাতের মানুষ।

সুভাষ হিন্দুস্থানীতে এদের সাথে কথা বলছিল।

সুভাষের সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর, সেই অনুভূতি মাখান কথা, সেই সুখ দুঃখের কাহিনী আজো আমার কানে গানের সুরের মতো বাজে। সেই দিনকার সেই বক্তৃতা, আমার শিরা উপশিরায় উত্তেজনার ঢেউ তুলেছিল। সেই বক্তৃতা শুনে আমার মনে হল আমি সত্যিই যেন স্বাধীন ভারতের নাগরিক—আজাদ হিন্দের কর্মী। আমার সোনার ভারত, শস্য শ্যামলা দেশ —আজ পরাধীনতার শৃঙ্খলে জর্জরিত।

বক্তৃতা দিতে দিতে সুভাষ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। কতোক্ষণ সুভাষ বক্তৃতা দিয়েছিল জানিনে, হয়তো ঘণ্টা দেড়েক হবে।

বক্তৃতা শেষে তাকিয়ে দেখলাম যে শ্রোতার দল স্তব্ধ। যেন আজ তারা তাদের হারানো নেতাকে খুঁজে পেয়েছে। দেখতে পেয়েছে তারা মুক্তির পথ—শুনতে পেয়েছে স্বাধীনতার বাণী।

বক্তৃতা শেষে শ্রোতার দল সবাই এগিয়ে এলো। সুভাষকে এসে বললে: তুমি আমাদের নেতা, আমাদের পথ-প্রদর্শক। তুমি নিয়ে চলো আমাদের মুক্তির পথে—করো তোমার সাথী। আজ থেকে আমরা আজাদ হিন্দ সংঘের কর্মী—আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য।

*　　　*　　　*

এরপর থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের কাজ আরো বাড়ল। এই বাহিনী গঠন করা ছিল সুভাষের বহুদিনের কল্পনা, বহুকালের স্বপ্ন। আজ সেই ধ্যানকে বাস্তবে পরিণত করতে পারলে।

মাস কেটে আবার বছর ঘুরে এলো। সুভাষের জন্মদিন। আমরা সবাই ওঁর হোটেলে গিয়ে জড়ো হলাম।

সুভাষ বললে: আমার আগামী জন্মতিথি দেশের মাটিতেই করব।

সেদিনকার মন্তব্য তখন পুরোপুরি উপলব্ধি করি নি।

বহুদিন বাদে যখন শুনতে পেলাম সুভাষ তার আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে ইম্ফলের পানে এগিয়ে চলেছে, তখন বুঝতে পেরেছিলাম এ কথার তাৎপর্য কী?

*　　　*　　　*

'আমাদের একমাত্র কামনা দেশের স্বাধীনতা। যদি প্রয়োজন হয় তবে এর জন্যে আমরা প্রাণ বিসর্জন করতে কুণ্ঠিত হবো না।'

২৬শে জানুয়ারী, দেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সুভাষ এক বক্তৃতায় এই কয়েকটি কথা বললে। সে দিন সুভাষ বক্তৃতা দিয়েছিল জার্মান ভাষায়। এই কয়েক দিনের মধ্যে সুভাষ জার্মান ভাষা বেশ আয়ত্ত করেছিল।

সেদিনকার সভা বেশ জমজমাট হয়েছিল। জার্মান সরকারের বিশিষ্ট কর্মচারী, বিদেশী সরকারের দূত, সবাই এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

এই সভায় সুভাষ প্রকাশ্যে ঘোষণা করলে: আজ থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজ দেশের স্বাধীনতার জন্য হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করবে।

*　　　　*　　　　*

এই কাজের ব্যস্ততার মাঝে আমাদের এক ছোট সমস্যা দেখা দিল। প্রশ্নটা আর কিছু নয়, সুভাষের পদবী নিয়ে। আজাদ হিন্দের নেতা সুভাষ নামে শুধু তাকে ডাকা যায় না। পদবীর প্রয়োজন।

কী হবে সেই পদবী, তাই নিয়ে বাদানুবাদ সুরু হল। কিন্তু শেষ অবধি সুভাষই এই সমস্যার সমাধান করে দিলে। তার মীমাংসায় আমরা সবাই খুশী। যাক্ তবু একটা গৃহ বিবাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেছে।

*　　　　*　　　　*

আজ নেতাজী সুভাষ বোস, অতীতের স্মৃতি, ঐতিহাসিকের গবেষণার পাত্র। কিন্তু একদিন তাঁর জীবন দেশে এনেছিল আলোড়ন, তুলেছিল বিপ্লবের তুফান। আজ তাঁর জীবনের প্রতি অধ্যায়, যার সাথে মিশে আছে বাঙালীর বহু সংগ্রাম, আলোচনা করে লাভ নেই। সেই কাহিনী রোমন্থণ অনাবশ্যক। তাই শুধু বলা যাক তাঁর জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৯২০ শতাব্দীর বাংলা।

দেশের প্রতি ঘরে ঘরে উচ্চারিত হচ্ছে স্বাধীনতার জয়গান। বিদ্রোহী বাংলা, বিদ্রোহী তার সন্তান। রাজাকে দেখে সম্ভ্রমে সরে দাড়ায় না, তিরস্কারে করে না মাথা নত।

এই স্বাধীনতার তুফান কে এনেছে বাঙালীর ঘরে ?

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

কলকাতার মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাচন হচ্ছে। সে নির্বাচনের প্রার্থী হচ্ছেন দেশবন্ধু।

দেশবন্ধু জয়লাভ করলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে এলেন সুভাষচন্দ্র। সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে সুভাষ বরণ করে নিয়েছে এক বিপদসঙ্কুল জীবন—সংগ্রামের পথ।

তারপর দ্বিতীয় যুদ্ধের প্রারম্ভে, সুভাষ বেরিয়ে এল দেশ থেকে। অজানা, অখ্যাত ভারতীয়রা তখন ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে। সুভাষ এসে দেখা

দিল তাদের মাঝে—তাদের মনে দিল সাহস, মুখে দিল স্বাধীনতার বাণী। বিভিন্ন ভাষাভাষি, বিভিন্ন অঞ্চলের ভারতীয়দের আজাদ হিন্দ সংঘে এনে জড়ো করা বড় সহজ কাজ নয়। তবু সুভাষের কর্মতৎপরতায় এক ভারতীয় সৈন্যবাহিনী গড়ে উঠল।

এই সৈন্যবাহিনী গঠনই ছিল সুভাষের কাজের মাধুর্য্য। তারপর বার্লিনে, স্বাধীন সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে সুভাষকে প্রায়ই বিদেশী সরকারের রাজদূতের সাথে সাক্ষাৎ করতে হতো। হয়ত এ কাজে সুভাষই ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম। কারণ কূটনীতির কাজে যদিও সে অনভিজ্ঞ ছিল, তবু অল্প কয়েক দিনের মধ্যে একাজে সে পারদর্শী হয়ে উঠলো।

* * *

স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্র নীতি কী হবে এই নিয়ে বহুদিন সুভাষের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে।

সুভাষ বলতো : জানো হে গিরিজা, বিদেশী সরকারের সঙ্গে এই যে সম্পর্ক স্থাপন করছি এর মূল্য আছে। আমরা ভারতীয়, আমাদের দৌড় বড় জোর ইংরেজ ও আমেরিকান সরকার অবধি। ওদের দৃষ্টি দিয়েই আমরা অন্য জাতিকে যাচাই করি। তাই আজকে আমাদের প্রয়োজন নতুন নতুন জাতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা, অপরিচিতকে জানবার চেষ্টা করা। একাজে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আর আজকে আমাদের অভাব সেই অভিজ্ঞতার।

এর উত্তরে আমি কী জবাব দিয়েছিলাম মনে নেই। স্মরণ আছে সুভাষ বলেছিল : শুধু মাত্র আদর্শের উপর ভিত্তি করে দেশের পররাষ্ট্র নীতি চলতে পারে না। দেশের পররাষ্ট্র নীতি হলো দাবার খেলা। তাই প্রয়োজন বোধে নীতির হেরফের করতে হয়—কারণ দেশের স্বার্থের উপরে আর কোন জিনিষ নেই। তাইতো নাৎসী নীতির বিরোধী হয়েও জার্মান সরকারের কাছ থেকে সাহায্য নিতে আমরা কুণ্ঠা বোধ করিনি।

তারপর একটু থেমে বললে : তোমার দেশ যদি স্বাধীন হত, আর ইংরেজ ও আমেরিকানদের হুংকারে সেই স্বাধীনতা যদি টলটলায়মান হয়ে

উঠতো, তাহলে তুমি কী করতে? লড়াই। আমিও তাই করেছি। আজ আমার দেশ বিপন্ন—তাই ইংরেজের বিরুদ্ধে মুক্তকণ্ঠে লড়াই ঘোষণা করতে আমার কোন কুণ্ঠা নেই।

একদিন ভেবেছিলাম যে সুভাষ হল ফ্যাসিস্ট নীতির সমর্থক। আজ সুভাষের কথা শুনে নিজের ভুল বুঝে লজ্জা পেলাম। বুঝতে পারলাম সুভাষের কাছে সব চাইতে মহান হল ভারতবর্ষ, সব চাইতে কাম্য হল দেশের স্বাধীনতা। আর সর্বপ্রথম আকাঙ্খা ইংরেজকে দেশ থেকে বিতাড়ন করতে হবে। আগে ইংরেজকে তাড়াও, তারপর অন্য সব কিছুর বোঝাপড়া হবে।

শুধু নেতা হিসাবে নয়, সুভাষকে আমরা পেয়েছিলাম মানুষ হিসেবে। নিজের বরাদ্দ সিগারেট বাঁচিয়ে সে বিতরণ করেছে যাদের সিগারেটের প্রয়োজন বেশী তাদের মাঝে। এমনি ছোট খাটো বহু জিনিষ যার হিসেব নিকেশ করা চলে না, তাঁকে আমাদের প্রিয় নেতা করে তুলেছিল।

তাই যেদিন সে আমাদের বললে: ভাই তোমার রক্তের বদলে আমি তোমায় দেবো স্বাধীনতা, সেদিন আমরা এক বাক্যে চীৎকার করে বলেছিলাম নেতাজী জিন্দাবাদ—'আমরা রক্ত দিতে প্রস্তুত।'

* * *

একদিন খবর এল জাপানী বিমান হানা দিয়েছে কলকাতার বুকে।

খবরটা শুনে আমি গেলাম সুভাষের সঙ্গে দেখা করতে।

তখন ক্রীষ্টমাস, বাইরে বেশ জমজমাট ঠাণ্ডা। সুভাষের লাইব্রেরী ঘরে আমি প্রতীক্ষা করছিলাম—একটু বাদে সুভাষ নীচে নেমে এল। দেখতে পেলাম মুখ তার পাণ্ডুর হয়ে গেছে। একটু ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম: কী ব্যাপার, অসুখ করেছে না কি?

: না, কাল সারারাত্রি কলকাতার স্বপ্ন দেখেছি। কী দেখেছি সবটা মনে নেই, শুধু মনে আছে সেজদাকে (শরৎচন্দ্র বোস) আর কয়েকজনকে।

তারপর একটু কণ্ঠস্বর নীচু করে বললে : কলকাতার কোন খবর আছে কী গিরিজা? নিশ্চয় সেজদা'দের কিছু হয় নি।

জাপানী বিমানের হানার খবর তখনও সুভাষের কানে পৌঁছয় নি।

* * *

আমার আর একটা কথা মনে আছে।

দেশের নেতাদের নিয়ে সুভাষের সঙ্গে যখন আলাপ আলোচনা করছি তখন সে বলতো কে হবে ইতিহাসে স্মরণীয়, কে হবে অতীতের স্মৃতি। এতো সহজভাবে বিচার করে গেছে, তা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।

আজ সেই কথা ভেবে আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগে: সুভাষ কী জানতো ইতিহাসে তার কী স্থান হবে?

* * *

ষোলো

চির নতুনেরে দিল ডাক—

একত্রিশে ডিসেম্বর, বার্লিন ফরেইন প্রেস ক্লাবে বসে গুরুদেবের কবিতার এই কয়েকটি অক্ষর মনে করছিলাম। একটু বাদেই বার্দ্ধক্য জর্জরিত বছর বিদায় নেবে—এগিয়ে আসবে নতুন বছর।

কবির দল চিন্তা করেন নির্জনে—সাংবাদিক চিন্তা করেন বারোয়ারী আড্ডায়।

সেদিন প্রেস ক্লাবে বসে আমি ভাবছিলাম পুরান বছরের কথা। কী দেখেছি, কী দেখি নি।

কিন্তু হট্টগোলের মাঝে আমার চিন্তার হিসেব-নিকেশে বাধা পড়ল। ঘড়ির কাটা দ্রুত লয়ে রাত্রি বারোটার পানে এগিয়ে যাচ্ছে। একটু বাদেই আমরা নতুন বছরকে অভিনন্দন জানাব।

জনতাকে ভেদ করে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র, পল স্মিট এগিয়ে এল। তাকে ঘিরে দাড়ায় বৈদেশিক সাংবাদিকের দল। সংখ্যায় প্রায় একশো হবে।

সেদিন স্মিটের বক্তৃতার শেষের লাইনটি আজো আমার কাণে বাজছে :

: Meine Herren, die Hauptsache ist, Wir haben Herz ! (Sir, the main point is, we have heart.

এই বলে স্মিট তার গ্লাসটি তুলে ধরল। আমরা সবাই চীৎকার করে বললাম : শুভ নববর্ষ।

দূর থেকে ভেসে এলো মিলিটারীর বাদ্য। সুরটা পরিচিত। আমরা সবাই এবার তৈরী হই নাচের জন্যে।

আমার টেবিলে এক জাপানী সাংবাদিক বসে ছিল। স্মিটের কথা শুনে বিদ্রূপ করে বললে :

Biensur, Herz, parceque be cerveal, iun'y-en a pas. (By all means there is heart, but there is no brain)

*   *   *

বার্লিনে ফাসেনস্ট্রাসের ধারে ফরেইন প্রেস ক্লাব। জনাকীর্ণ, হট্টগোলের শেষ নেই। এখানে এলে মনে হয় না যে, জার্মান দেশের উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে চলেছে।

প্রতিদিন এখানে বিভিন্ন জাতির সমাবেশ হয়! হাঙ্গারিয়ান, নরোওয়েবাসী ইতালিয়ান, বেলজিয়ান, ডাচ, জাপানী। সবাই প্রায় নিশ্চিন্দি যে, এই লড়াইতে জার্মানীর জয় সুনিশ্চিত।

মাস কেটে বছর যায়। ক্রমে ক্রমে রাশিয়ান প্রান্তে পরাজয়ের প্লাবন দেখা যায়। কিন্তু সাংবাদিক মহলে তখনও নেই কোন নৈরাশ্যের চিহ্ন। তখনও মুক্তকণ্ঠে দেশের ভালমন্দ নীতি নিয়ে প্রেস ক্লাবে আলোচনা করা যায়, পাওয়া যায় অপরিমিত সিগারেট, মদ, কফি।

কিন্তু এই স্বাধীনতা, এই প্রাচুর্য্য ক্ষণিকের। জার্মান বাহিনী পশ্চাদপসরণ সুরু করেছে। জনকোলাহল মুখরিত বার্লিনের রাস্তায় ধীরে ধীরে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় শত্রুর বিমানবাহিনী হানা দেয় বার্লিনের বুকে

আতঙ্ক এসে দেখা দেয় জনতার মাঝে।

কিন্তু দেশের নেতা হিটলার, তিনি অবিচলিত। জার্মানবাহিনীর পশ্চাদ-পসরণ ও রাশিয়ানদের অগ্রগতি তার মনে কোন আতঙ্কের সৃষ্টি করেনি।

কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই একটি ঘটনা হিটলারকেও চিন্তিত করে তুললো।

সে হলো তার বন্ধু মুসোলিনীর পতন।

*   *

দক্ষিণ আফ্রিকার জার্মান বাহিনীর পরাজয়ের পর বিপদ এসে হানা দিল ইতালির দ্বারে। কয়েকদিন বাদেই মিত্রশক্তি ইতালিকে আক্রমণ

করলে। ক্রমে ক্রমে জার্মানি ও ইতালির সম্পর্ক শিথিল হয়ে আসতে লাগল।

বেগতিক দেখে, হিটলার মুসোলীনির সাথে দেখা করলেন। লড়াইর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মুসোলীনি ক্রমেই সন্দিহান হয়ে উঠছেন। ভবিষ্যৎ কী যে হবে জানা যায় না। অতএব এবার হিটলারের আশ্বাসে তিনি বিশেষ উৎসাহিত হলেন না।

ইতিমধ্যে ইতালি দেশের ভেতর জনতার অসন্তোষ ক্রমেই বাড়ছে। সৈন্যরা বিদ্রোহ করছে, দেশের রাজাও মুসোলীনির উপর আস্থা হারিয়েছেন। ধীরে ধীরে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ গিয়ে দেখা দিল জনতার মাঝে। ব্যস আর কথা নেই। হঠাৎ একদিন শোনা গেল মুসোলীনি ক্ষমতা হারিয়েছন। তাকে বন্দী করা হয়েছে। সেনাদের নেতা, মার্শাল বদগলিও এবার দেশের সর্বে সর্বা, হর্তা-কর্তা-বিধাতা হয়েছেন।

*　　　　*　　　　*

এই চমকপ্রদ খবরে হিটলার প্রথমে একটুও বিচলিত হলেন না। বিপদে ধীর স্থির থাকাই তার অভ্যেস।

হিটলারের শিবিরে এবার সৈন্যবিভাগের বড় কর্তাদের বৈঠক বসল। এলেন ফিল্ডমার্শাল রমেল, জডোল। তলব হল গোয়েরিং গোয়েবল্‌সের।

হিটলারের প্রানের বন্ধু মুসোলিনী। শত্রুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে হবেই। আর শুধু তাই নয়, ইতালির ভবিষ্যতের সাথে জার্মানীর ভবিষ্যৎও কিছুটা জড়িয়ে আছে। মার্শাল বদগলিওকে একটুও বিশ্বাস নেই। জার্মানীর অজান্তেই হয়ত যুদ্ধের আপোষ মীমাংসা করে বসবে। তাই হিটলার ঠিক করলেন, প্রথমতঃ মুসোলীনিকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, রোম দখল করে নেয়া, তৃতীয়তঃ, মুসোলীনি সরকারকে পুনরায় কায়েম করা, চতুর্থতঃ, সমস্ত ইতালিয়ান নৌবাহিনীকে ধ্বংস করা। সৈন্যবিভাগের কর্তারা কিন্তু হিটলারের সাথে একমত নন। তাদের ধারণা

বর্তমান পরিস্থিতিতে মার্শাল বদগলিওকে বেশী চটিয়ে লাভ নেই। কিন্তু গোয়েরিং গোয়েবলস হিটলারকে সমর্থন করলেন।

কী করে মুসোলিনীকে উদ্ধার করা যায় এ নিয়ে যখন দুদলে টানা হাঁচরা চলছে তখন হঠাৎ একদিন শোনা গেল, ইতালি মিত্র শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। দুদলের ভেতর সন্ধি হয়ে গেছে।

*　　　　*　　　　*

খবরটা শুনে হিটলার চমকে গেলেন। তিনি তখন ইউক্রেন প্রান্তে রাশিয়ার লড়াইর পরিচালনা করছেন। ব্যাপারটা যে এ্যদ্দুর গড়াবে এটা ছিল তার কল্পনার অতীত। ইতালি সন্ধি করার ঠিক কিছুদিন আগে হিটলার এক বাহিনী পাঠিয়ে মুসোলিনীকে উদ্ধার করেছেন। তাই তিনি মুসোলিনীকে নিয়ে আবার শলা পরামর্শ করতে লাগলেন কী করে মিত্রশক্তিকে ইতালি থেকে তাড়ান যায়, কী করে আবার ফাসিস্ত সরকারকে গদীতে বসান যায়।

মুসোলিনীর শরীর তখন ভেঙ্গে পড়েছে। লড়াই চালাবার মত শক্তি তার আর নেই। কিন্তু উপায় নেই, নিজের ইচ্ছে মতো কাজ করার ক্ষমতা তিনি হারিয়েছেন বহুদিন আগেই। আজ তিনি হিটলারের হাতে কলের পুতুল। আজ হিটলারের আদেশ তার কাছে শিরোধার্য। শুধু তাই নয়, নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তিনি তার মেয়ের স্বামী কাউন্ট চিয়ানোকে জার্মানদের হাতে তুলে দিয়েছেন তাকে গুলী করে মেরে ফেলবার জন্যে। এর চাইতে গ্লানি আর কী থাকতে পারে।

হিটলার দমবার পাত্র নন। মুসোলিনীকে নিরুৎসাহ দেখে তিনি একটুও ঘাবড়ালেন না। সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে তিনি ইতালির ঘাঁটিগুলো দখল করে নিলেন।

কিন্তু হিটলারের এ সাফল্য ক্ষণিকের। কারণ রাশিয়ান প্রান্তে তখন পরাজয়ের প্লাবন শুরু হয়েছে। ফ্রান্স সীমান্তেও মিত্রশক্তির আক্রমণ আসন্ন। শুধু তাই নয়, সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ দিন দিন বাড়ছে।

তার প্রমাণ পাওয়া গেল শিগগিরই। একদিন তিনি যখন লড়াইর

পরিস্থিতি নিয়ে সেনাপতিদের সাথে আলোচনায় ব্যস্ত, তখন তাকে হত্যা করার এক ব্যর্থ চেষ্টা হলো।

এই চক্রান্তের পেছনে ছিলেন দেশের প্রধান প্রধান সেনাপতিরা। আর হত্যা করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন স্টাউফেনবুর্গ বলে এক সেনাপতি।

* * *

লড়াইর প্রথম থেকেই হিটলারের ছিল সেনাপতিদের প্রতি বিদ্বেষ। হিটলার বলেন সেনাপতিরা কিছুই জানে না। নইলে তারা তো বলেছিলো পোল্যাণ্ড দখল অসম্ভব। তবু তুড়ি দিয়ে হিটলার পোল্যাণ্ড কেড়ে নিলেন। তারপর এলো ফ্রান্সের যুদ্ধ। সেখানেও জার্মানীর সাফল্য সম্বন্ধে সেনাপতিরা সন্ধা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু হিটলার বিদ্যুৎ গতিতে সমস্ত ইউরোপ দখল করে নিলেন। রাশিয়া আক্রমণের প্রারম্ভে সেনাপতিরা ইতস্ততঃ করেছিলেন কিন্তু প্রথম কয়েক মাসের সাফল্যর পর হিটলার বড়াই করে বললেন যে তার সেনাপতিরা সব মূর্খ। লড়াই সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ।

তারপর সুরু হলো ভাগ্যবিপর্যয়। আফ্রিকা ও রাশিয়া প্রান্তে মিত্র শক্তির কাছে জার্মানীকে মাথা নত করতে হলো। সেনাপতিদের ধারণা এই পরাজয়ের কারণ হিটলার—তার খামখেয়ালী। তিনি ইচ্ছে মতো যুদ্ধের প্ল্যানের অদল-বদল করেন। এই কারণে সৈন্যবাহিনীর ভেতর অসন্তোষ ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল।

সৈন্যবাহিনীর সাথে এবার এসে যোগ দিলে জনসাধারণ। কারণ হিটলারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ আজকের নয়, বহুদিনকার। এই চক্রান্তের ভেতর নেতা ছিলেন জেনারেল লুডউগ, বেক এবং লিপজিগের বুর্গোমাষ্টার কার্ল গোয়েবডেলার। এ ছাড়া ভূতপূর্ব রোমে অবস্থিত জার্মান রাজদূত, উলরিখ ফন হাসেল, ফিল্ড মার্শাল উইটজ লেবেন এবং গুপ্তচর বিভাগ, আবভেরের প্রধান কর্তা এডমিরাল কেনারির নাম উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া আর দুদল গোপনে গোপনে হিটলারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছিলেন। প্রথম দলের নাম ক্রেইস্‌্ সার্কেল।

লড়াইয়ের পরিস্থিতি দেখে এই সার্কেলের সদস্যরা জার্মানীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন। নিত্যই তাদের বৈঠক বসতো, আলোচনা হতো জার্মানী ও নাৎসীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। এই দলের নেতা ছিলেন গ্রাফ হেলমুথ মোলটকে এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের এডাম ফন ট্রট, যার সাহায্যে সুভাষ জার্মানীতে এসেছিল। দ্বিতীয় দলের অধিকাংশই ছিলেন সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দলের সদস্য।

*　　　　*　　　　*

স্টালিনগ্রাদের পরাজয়ের পর সেনাপতির দল সত্যিই জার্মান বাহিনীর জয় সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে পড়লে। তাই গোপনে গোপনে চেষ্টা সুরু হলো কী করে হিটলারকে সরানো যায়। এ কাজের দায়িত্ব নিলেন জেনারেল ফন ট্রেসকাউ ও ফেবিয়ান ফন শ্লাবেনড্রফ।

১২ই মার্চ, ১৯৪৩, এরা দুজনে গেলেন হিটলারের সাথে দেখা করতে। সাক্ষাতের পর হিটলারের শিবিরে একটি 'টাইম বোমা' রেখে এলেন। কিন্তু বোমা ফাটলো না। বেগতিক দেখে শ্লাবেনড্রফ ফিরে এলেন হিটলারের শিবিরে। সবার অজান্তে বোমাটি সরিয়ে ফেললেন। এই চক্রান্তের কথা কেউ জানতে পারলে না। ইতিমধ্যে জার্মান কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স বিভাগের কর্তারাও স্পষ্ট বুঝে নিয়েছিলেন এ লড়াইতে জার্মানীর জয় অসম্ভব। তারাও গোপনে গোপনে চক্রান্ত করতে লাগলেন কী করে হিটলারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

কিছুদিন বাদে কাউণ্টার ইনটেলিজেন্সের দপ্তরে এসে যোগ দিলেন কর্ণেল ফন স্টাউফেনবার্গ বলে এক তরুণ অফিসার। দক্ষিণ আফ্রিকার লড়াইতে জখম হয়ে স্টাউফেনবার্গ এসেছিলেন বার্লিনে। সেখান থেকে কাউণ্টার ইনটেলিজেন্স দপ্তরে। সেখানে বসে বসে তিনি পাঁয়তারা কষতে লাগলেন কী করে হিটলারকে হত্যা করা যায়। সৈন্য বিভাগের সাথে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করলেন। শুরু হলো বৈঠক, আরম্ভ হলো আলোচনা। চক্রান্তের প্রথম কাজ হলো হিটলারকে হত্যা করা—তারপর দেশব্যাপী বিপ্লব। প্রথম কাজের

দায়িত্ব স্টাউফেনবার্গ নিজেই নিলেন আর বিপ্লবের আয়োজন করার দায়িত্ব পড়ল সৈন্য বিভাগের উপর। বন্দোবস্ত হলো যে হিটলারকে হত্যার পর জেনারেল বেক্ হবেন জার্মানীর কর্তা আর ফিল্ডমার্শাল উইটজলেবেন হবেন সৈন্য বাহিনীর সুপ্রীম কমাণ্ডার। আর জেনারেল ওলবিরথত হবেন যুদ্ধ মন্ত্রী।

*　　　*　　　*

হিটলারের ডান হাত হলেন হাইনরিথ হিমলার। তিনি হলেন সরাষ্ট্র সচিব এবং গুপ্তচর ও পুলিশ বিভাগের কর্তা। তার কাছে খবর গেলো যে হিটলারের বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত দানা পাকিয়ে উঠছে। ব্যস আর কথা নেই। চক্রান্তের নেতাদের মধ্যে কাউকে কাউকে গ্রেপ্তার করা হলো, কাউকে তাদের কাজ থেকে বিদায় দেয়া হলো।

এই সব গ্রেপ্তার দেখে বিদ্রোহিদের দল এবার একটু সতর্ক হলেন। হুঁসিয়ার হয়ে তারা তাদের কাজ গোপনে করতে লাগলেন। কিন্তু তাদের হাতে সময় বেশী নেই। দেরী করলে জার্মানীর ধ্বংস অনিবার্য। কারণ পূর্বপ্রান্ত থেকে দুর্বার স্রোতের মতো এগিয়ে আসছে রুশ বাহিনী আর পশ্চিম প্রান্তেও তাদের দেখা দিয়েছে যুদ্ধের কালো মেঘ।

*　　　*　　　*

জুন মাসের ছয় তারিখ ১৯৫৪।

যুদ্ধের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিবস।

ফ্রান্সের উপকূলে, নর্মাণ্ডীর অঞ্চলে ইংরেজ, আমেরিকান সৈন্যবাহিনী তাহাদের আক্রমণ সুরু করলে। এবার স্টাউফেনবার্গের দল ভেবে দেখলে যে দেরী করলে তাদের আপশোষ করতে হবে। অতএব শুভস্য শীঘ্রম।

জুলাই মাসের এগারো তারিখ।

বার্কটেসগ্যাডেনে হিটলারের শিবিরে বসেছে সেনাপতিদের বৈঠক। সেই বৈঠকে যোগ দিতে এলেন স্টাউফেনবার্গ। সঙ্গে নিয়ে এলেন একটি এটাচি কেস।

তার ভেতর আছে একটি টাইম বোমা। কিন্তু এসে দেখেন হিমলার ও গোয়েরিং দুই-ই অনুপস্থিত। নাৎসী দলের চাঁই। কেউই এই বৈঠকে যোগ দিতে আসেন নি। অতএব স্টাউফেনবার্গ মত পালটালেন। শুধু হিটলারকে নন, নাৎসী দলের বড়োকর্তাদেরও তিনি ধ্বংস করতে চান। তাই সে যাত্রায় চুপ করে গেলেন। আবার সুযোগের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

কয়েকদিন বাদে আবার সুযোগ মিললো। লড়াই জার্মানীর পক্ষে ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে উঠছে। পূর্বপ্রান্ত থেকে রুশ বাহিনী পোল্যাণ্ড দখল করে জার্মানীর দ্বারে এসে পৌচচ্ছে। ইতালির প্রান্তে ব্রিটিশ জেনারেল আলেকজাণ্ডার রোম দখল করে নিয়েছেন। আর পশ্চিম প্রান্তে আমেরিকার ও ইংরেজ বাহিনীর সাথে তুমুল লড়াই চলছে।

পশ্চিমপ্রান্তে জার্মান বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ফিল্ডমার্শাল রুনস্টেড। তারসঙ্গে আছেন ফিল্ডমার্শাল রমেল। দুই সেনাপতির দুই মত। রুনস্টেড বলেন মিত্র শক্তিকে আগে ফ্রান্সের মাটীতে নামতে দেয়া হোক। তারপর তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে। রমেল বলেন সেইটে হবে বিপদ। কারণ একবার মিত্রশক্তিকে মাটীতে নামতে দিলে তাদের হটানো মুস্কিল হবে। অতএব তাদের সঙ্গে ইংলিশ চ্যানেলেই লড়তে হবে। ফ্রান্সের উপকূলে তাদের কিছুতেই নামতে দেয়া ঠিক হবে না। কিন্তু শেষ অবধি রুনস্টেডের মতানুযায়ীই কাজ হলো। ফ্রান্সের উপকূলে মিত্র শক্তিকে নামতে দেয়া হলো।

নর্ম্যাণ্ডীর অঞ্চলে পা দিয়ে মিত্রশক্তি মরিয়া হয়ে সংগ্রাম সুরু করলে। জার্মান বাহিনীর বিপদ ক্রমেই বাড়তে লাগল।

এই সংকট মুহূর্তে স্টাউফেনবার্গের দল রুনস্টেডের ও রমেলের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করলে।

রুনস্টেড ও রমেলের সমর্থন পেলে তারা একেবারে নিশ্চিন্দি।

হিটলারের কার্য্যকলাপে রুনস্টেডেরও বিরক্তি ধরে গিয়েছিল। তাই

স্টাউফেনবার্গের প্রস্তাবে তিনি মনে মনে খুশি হলেন বটে কিন্তু প্রকাশ্যে সমর্থন দিতে একটু ইতঃস্তত: করতে লাগলেন।

কিন্তু স্টাউফেনবার্গের দল সাহয্য পেল রমেলের কাছ থেকে। হিটলারের খামখেয়ালী রমেলের কাছে প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে মিত্র শক্তির নর্ম্যাণ্ডীর আক্রমনের পর। কিছুদিন আগে এক বৈঠকে হিটলারের কাছে তাকে আর রুনস্টডেকে জার্মান বাহিনীর পরাজয়ের জন্যে ধমক শুনতে হয়েছে। কাজেই রমেলের মনটা একটু বিগড়ে ছিল।

* * *

জুলাই মাসের কুড়ি তারিখ।

সেদিন বিকেলে হিটলার মুসোলিনীর সাথে সাক্ষাৎ করবেন। ভোরবেলা যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্যে হিটলার বড়ো বড়ো সেনাপতিদের তলব করলেন। সেই সঙ্গে আবার এলেন স্টাউফেনবার্গ। সদ্য তিনি এক নতুন বাহিনীর অধিনায়ক হয়েছেন। কাজেই তার গঠন কাজ নিয়ে হিটলারের সাথে আলোচনা করতে হবে। স্টাউফেনবার্গের হাতে একটা ছোট ব্যাগ। সেই ব্যাগের ভেতর আছে মারাত্মক অস্ত্র টাইম-বোমা।

স্টাউফেনবার্গকে হিটলারের কাছে নিয়ে এলেন জেনারেল কাইটেল, সৈন্যবাহিনী সুপ্রীম কম্যাণ্ডার। বিরাট কনফারেন্স ঘর। সেইখানে আরো অনেক বড়ো বড়ো কর্তারা আছেন। কাইটেল, জডল, ব্রাণ্ড। অবশ্যি স্টাউফেনবার্গ যাদের আশা করিছিলেন তারা নেই অর্থাৎ গোয়েরিং, হিমলারের দল। স্টাউফেনবার্গ হিটলারের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর সুবিধে বুঝে টেবিলের নীচে তার ব্যাগটি রাখলেন।

যুদ্ধের আলোচনা যখন পুরোদমে চলছে তখন একটা টেলিফোন করার অছিলা দিয়ে স্টাউফেনবার্গ বেরিয়ে গেলেন।

একটু বাদে স্টাউফেনবার্গের বোমাটি বিরাট শব্দ করে ফেটে উঠল। ভেঙে গেল দরজা, ছাদ। ভাঙা কাঠে জ্বলে উঠল আগুন। সবাই সাহায্যের জন্যে চীৎকার করতে লাগলেন।

যার জন্যে এ বোমা, তিনিই সে যাত্রায় রক্ষা পেয়ে গেলেন। হিটলার অল্পবিস্তর চোট পেলেন সত্য, কিন্তু প্রাণ রক্ষা পেল। তার কারণ বোমাটি ছিল টেবিলের নীচে—আর হিটলার টেবিলের উপর ভর দিয়ে কথা বলছিলেন। বোমার আসল চোটটা গেল টেবিলের উপর।

এতো উত্তেজনার ভেতরও হিটলার ধীর স্থির রইলেন। বিপদেও তিনি বুদ্ধি হারান না—এইটে ছিল তার সবচাইতে বড়ো গুণ। তারপর বিকেলে তিনি মুসোলিনীকে অভ্যর্থনা করতে গেলেন। তার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হল।

*　　　　*　　　　*

বিদ্রোহের জন্যে স্টাউফেনবার্গের বন্ধুরা প্রস্তুত হয়েছিলেন। স্টাউফেনবার্গও হিটলারের ঘর থেকে নিশ্চিন্দি মনে বেরিয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন বোমার হাত থেকে হিটলারের নিষ্কৃতি নেই। অতএব এয়ারপোর্টে এসে তিনি বন্ধুদের জানালেন যে তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

হিটলারকে হত্যা করা ছাড়া চক্রান্তকারীদের আর একটি মৎলব ছিল। সে হলো টেলিগ্রাফ, টেলিফোনের তার কেটে দেয়া এবং হিটলারের হেডকোয়ার্টারকে সৈন্যবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। একাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন জেনারেল ফেলগিবেল। স্টাউফেনবার্গ যেমনি তার উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হয়েছিলেন, জেনারেল ফেলগিবেলের প্ল্যানও তেমনি বেসামাল হয়েছিল। অতএব বোমা ফাটার একটু বাদেই জেনারেল কাইটেল সমস্ত সৈন্যবাহিনীর কাছে খবর পাঠাতে লাগলেন যে হিটলার বহাল তবিয়তেই জীবিত আছেন।

স্টাউফেনবার্গের বন্ধুরা যখন জানতে পারলে যে তাদের দুটো মৎলবই ভেস্তে গেছে, তখন তাদের আর ফেরবার উপায় নেই। কারণ ব্যাপারটা তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তারা বিদ্রোহের জয়ধ্বজা উঠিয়েছেন। এর পরে যা হবার তাই। বিদ্রোহীদের উচ্ছেদ সুরু হল। হিমলার তার তদন্ত সুরু করলেন। প্রাণ দিলেন স্টাউফেনবার্গ, ওলব্রিখত, জেনারেল বেক্।

*　　　　*　　　　*

এই বিপ্লবের জন্যে আর একজনের প্রাণ দিতে হ'ল, যিনি জার্মান যুদ্ধের ইতিহাসে বিখ্যাত। তিনি হলেন ফিল্ড মার্শাল রমেল।

আফ্রিকার যুদ্ধের পরাজয়ের পর রমেলকে দেওয়া হয়েছিল ইতালি সৈন্যদের পরিচালনার ভার। তারপর যখন মিত্রশক্তি ফ্রান্স আক্রমণ করলে তখন তাকে সেই অঞ্চলে তলব করা হলো। জেনারেল রুনস্টেডের সঙ্গে সেই অঞ্চল পরিচালনা করার ভার তিনিও পেলেন।

হিটলারের খামখেয়ালী দেখে রমেল ভাবলেন যে হিটলারের হাত থেকে নিষ্কৃতি না পেলে জার্মানীর জয় অসম্ভব। অতএব স্টাউফেনবার্গের দলের সাথে তিনিও যোগ দিলেন। স্বীকার করে নিলেন জেনারেল বেকের অধীনতা।

ইতিমধ্যে নর্মাণ্ডীর প্রান্তে লড়াই ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে হঠাৎ একদিন হিটলার রুণস্টেডকে ঐ অঞ্চল থেকে বদলী করলেন। রুণস্টেডর বদলীর খবর রমেলের কাছে অপ্রত্যাশিত। তিনি এবার হিটলারকে সতর্ক করলেন। এখন থেকে সাবধান না হলে জার্মানীর বিপদ আসন্ন। হিটলারকে এই সতর্কবাণী পাঠিয়ে রমেল ঠিক করলেন যদি হিটলার তার পরামর্শ না শোনেন, তাহলে তিনি বিদ্রোহ করবেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ এ ঘটনার কয়েকদিন বাদে রমেল আহত হলেন এবং সেইজন্যে তাকে বেশ কিছুদিনের জন্যে ভুগতে হলো। তার বদলে নর্মাণ্ডী অঞ্চলের কর্তা হলেন জেনারেল ফন ক্লুগ। তার সাথে রুনস্টেড, রমেলের কোন সাদৃশ্যই নেই। জেনারেল ফন ক্লুগ স্টাউফেনবার্গের চক্রান্তের আভাষ পেয়েছিলেন। এর ভেতর যে রমেলও জড়িয়ে আছে এটা তিনি জানতেন। তাই সমস্ত খবর সরাষ্ট্র সচিব হিমলারকে জানাতে একটু দ্বিধাবোধ করলেন না।

*　　　　*　　　　*

হিমলার তখন গোয়েবলসের বাড়ীতে বসে তদন্ত করছেন। তার কাছে খবর এলো জেনারেল রমেলের কথা। তিনি হিটলারকে সমস্ত

ব্যাপারটা খুলে বললেন। রমেলও তখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন।

একদিন রমেলের কাছে হিটলারের চর এলো। ফ্যুরার রমেলকে তলব করেছেন। কী মৎলবে, রমেলের জানতে বাকী নেই। হয় আত্মহত্যা নয় কোর্ট মার্শাল, এই দুটো পথ দেওয়া হয়েছে রমেলকে। প্রথম পথটাই রমেল বেছে নিলেন।

এমনি করে হিটলার তার সব চাইতে জনপ্রিয় জেনারেলকে হারালেন। জার্মান সৈন্যবাহিনী হারালে তাদের শ্রেষ্ঠ জেনারেল।

* * *

সতেরো

বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ শুধু সৈন্যবাহিনীর মধ্যে নয়—দেশের জনতার ভেতরও বাড়ছিল। লড়াইর হালচাল সবাইকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। এর প্রথম আভাষ পেলাম প্রেস ক্লাবে। দূরপ্রান্তে যখন শত্রুর বাহিনী, আমরা তখন উঁচু গলায় প্রেসক্লাবে নির্ভয়ে আলোচনা করেছি। ক্রমে ক্রমে শত্রুর পদধ্বনি জার্মানীর দ্বারে স্পষ্ট হয়ে উঠল। প্রেসক্লাবের স্বাধীন আলোচনারও ভাঁটা পড়ল।

দেশের মধ্যে যখন এমনি অসন্তোষের বাষ্প দেখা দিয়েছে, তখন আর একটা আভ্যন্তরীণ গোলযোগ সাংবাদিক মহলকে বিশেষ বিচলিত করে তুললো। ব্যাপারটা আর কিছু নয়। বার্লিনে সাংবাদিকদের জন্যে দুটো প্রেস ক্লাব। একটার কর্তা পররাষ্ট্র দপ্তর, আর একটা হলো প্রচার বিভাগের। যাদের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রেসক্লাবে যাতায়াত, তাদের জন্যে প্রচার বিভাগের প্রেস ক্লাবের দ্বার বন্ধ। এই পার্থক্য শুধু বিদেশী সাংবাদিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো না—জার্মান সাংবাদিকদেরও আমাদের মতো অবস্থা। এক প্রেসক্লাবে গেলে, অন্যত্র যাবার যো নেই। লড়াই যতোই জার্মানীর নিকট এগিয়ে আসতে লাগল—পররাষ্ট্র দপ্তর আর প্রচার বিভাগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ততোই বাড়তে লাগল।

* * *

প্রেস ক্লাবে দেখতে পেতাম নিত্যি নতুন মুখ।

পরিচয় হলো গ্রাণ্ড মুফতীর সাথে। তার কায়দাদুরস্থ ফরাসী ভাষা শুনে আমি মুগ্ধ। প্রায়ই যাই তার ওখানে। জার্মানদের শক্তি সম্বন্ধে এককালে তিনি প্রায় নিশ্চিন্দি ছিলেন। কিন্তু লড়াইর পরিস্থিতি দেখে তিনি হাল ছেড়ে দিলেন। বুঝতে পারলেন যে ভুল নৌকায় তিনি পা দিয়েছেন।

*　　　　*　　　　*

একদিন গ্রীষ্মকালে হঠাৎ জন আমেরীর সাথে দেখা। আমেরী তখন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। কারণ তার বাবা ইংরেজ, সরকারের একজন মহারথী। ভারতবর্ষ চালাবার লাগামটা তারই হাতে। এক কথায় বলা যায় তিনি হলেন ভারতবাসীর ভাগ্যবিধাতা—ন্যায় অন্যায়ের বিচারক।

এ হেন ব্যক্তির ছেলে হওয়া জন আমেরীর পক্ষে ভাগ্যের কথা। কিন্তু আমেরী তার ভাগ্য সম্বন্ধে চিন্তা করেনি বরং ইংরেজ জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জার্মান রেডিওতে বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছে।

আমেরীর বক্তৃতার মূল্য আছে। এ কথাটা জানতো জার্মান সরকার, জানতো ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট কিন্তু জানতো না শুধু জন আমেরী। তার আশে-পাশে কী ঘটছে সেটা নিয়ে সে কোনদিন চিন্তা করেনি বা আলোচনা করেনি।

প্রেস ক্লাবে জন আমেরী নিয়মিত আসতো। একদিন আমার পরিচিত এক বন্ধু এসে জিজ্ঞেস করলে, এক ইংরেজের সাথে কথা বলবে মুখুজ্যে।

কথাটা শুনে লাফিয়ে উঠলাম। বহুদিন ইংরেজী ভাষায় কথা বলিনি। তাই একটু ইংরেজীতে কথা বলবার লোভে প্রাণ আনচান করে উঠলো। সানন্দে জবাব দিলাম : নিশ্চয়।

আমার জবাব শুনে বন্ধু একটু নিরাশ হলেন। তার ধারণা ভারতের শত্রু ইংরেজ। দুষমনের সাথে কী কেউ হাত মেলাতে পারে, কথা তো দূরের কথা।

বন্ধুর মনের কথা বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না।

তাকে এবার একটু আশ্বাস দিয়ে বলি : আসল কথা কী জানো। বহুদিন ধরে ইংরেজীতে কথা বলার জন্যে প্রাণটা আইঢাই করছে।

একটু বাদে বন্ধু আমাকে জন আমেরীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

কিন্তু সেদিন আমেরীর সাথে আলাপটা জমে উঠলো না। কারণ সদাসর্বদাই গুপ্তচর তার পেছনে ছায়ার মতো ঘুরছে। মন খুলে কথা বলবার যো

নেই। এর পরে বহুদিন আমেরীর সাথে দেখা হয়েছে কিন্তু একটানা দুজনে বেশীক্ষণ কথা বলতে পারিনি। কারণ সদাসর্বদাই ওর সঙ্গে লোক আছে।

*   *   *

লর্ড হ-হ।

যুদ্ধের সময় ইংরেজরা জন আমেরীকে এই নাম দিয়েছিল। জার্মানরা জানতো তার বেতার বক্তৃতার যথেষ্ট মূল্য আছে কিন্তু বুঝতে পারেনি আমেরী, সে কী করছে? লড়াইর শেষ ভাগে যখন তার নেশা ছুটলো, তখন আর জার্মানদের ফাঁদ থেকে তার বেরুবার যো নেই।

আমেরী থাকত কাইসরহফ হোটেলে। তার সঙ্গে থাকত একটি ফরাসী মেয়ে। বহুদিনকার বন্ধুত্ব, প্যারীতে তাদের পরিচয়। হঠাৎ একদিন রহস্য-জনক ভাবে মেয়েটি মারা গেল।

একদিন বান্ধবীকে নিয়ে আমেরী প্রেসক্লাবে এসেছিল। গল্পে আর মদে তারা মশগুল। মাত্রাটা সেদিন একটু বেশীই হয়েছিল।

হোটেলে ফিরল তখন রাত প্রায় একটা। পরদিন আমেরী ঘুম থেকে উঠে দেখে, তার বান্ধবী বিছানায় এলিয়ে আছে। দেহে প্রাণ নেই। বান্ধবীর অবস্থা দেখে আমেরী তো হতভম্ভ। ভেবেই পেল না সে কী করবে।

আমেরীর বান্ধবীর আশ্চর্য্যজনক মৃত্যু নিয়ে বিশেষ কোন হৈ চৈ হলো না। সরকারী মহল একদম চুপ-চাপ। সাংবাদিক মহলও একেবারে নিস্তব্ধ। অবশ্যি গুজবের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। মেয়েটি নাকি নাৎসীদের অনেক কিছু গোপন তথ্য জানতে পেরেছিল, তাই তাকে হত্যা করা হয়েছে।

বান্ধবীর মৃত্যুর পর জন আমেরীর বহু পরিবর্তন হলো। এর পর আমরা তাকে দেখতে পেলাম এক নতুন মানুষ হিসেবে—ক্লান্ত, ভয়ার্ত, চিন্তিত জন আমেরী।

*   *   *

যুদ্ধের শেষে ইংরেজ সরকারের বিচারে জন আমেরীর ফাঁসি হল।

বহু ভারত সন্তানের ফাঁসির ছাড়পত্রে সাক্ষর করেছিলেন ভারত সেক্রেটারী আমেরী।

একদিন নিজের চোখেই নিজের সন্তানের ফাঁসি দেখে এলেন।

একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস।

*　　　　*　　　　*

ইতিমধ্যে সাংবাদিক মহলেও লড়াইর পরিস্থিতি নিয়ে কানাঘুষো সুরু হয়েছে। প্রতিদিন আমরা জয়-পরাজয়ের হিসেব নিকেষ করি।

বহুজনার সমাবেশ মানেই বহুমতের প্রচার। এ আলোচনার শেষ নেই, নেই মীমাংসা।

তবু এখানে আতংকের হাত থেকে রেহাই নেই। বাচালতার জন্যে নেই নিষ্কৃতি। ক্লাবের চারপাশে ঘুরছে হিমলারের গুপ্তচর গেষ্টাপো বাহিনী।

ইতিমধ্যে কয়েকদিন বাদে সুভাষ জাপানে চলে গেলো। যাবার আয়োজন বেশ কিছুদিন ধরেই চলছিলো। কিন্তু আমরা সমস্ত ব্যাপারটা গোপন রেখেছিলাম। মাসখানেক বাদে খবর এলো সুভাষ নিরাপদে টোকিও পৌঁচেছে।

এর পরের কাহিনী ঘটে গেলো দ্রুতলয়ে। সে কাহিনী আজ কারু অজানা নেই। পূর্ব এশিয়া প্রান্তে সুভাষ গড়ে তুললো আজাদ হিন্দ ফৌজ। সুভাষের আহবানে ভারতীয়রা দেশের জন্যে প্রাণ দিতে এগিয়ে এলো। সে সংগ্রাম আজ ইতিহাস বিখ্যাত।

সুভাষের সাফল্যের কাহিনী আমাদের কানেও ভেসে এলো। সে খবর শুনে আমরা সবাই উল্লাসিত হলাম। প্রতিদিন খবর আসত সুভাষ তার আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে ভারতের পানে এগিয়ে যাচ্ছে। সে খবর শুনে গর্ব্বে আমাদের বুক ফুলে উঠলো।

ক্রমে ক্রমে সুভাষের কাহিনী ফরেইন প্রেস ক্লাবে পৌঁছল। সেখানে এ খবর তুললো এক আলোড়ন। সবাই সুভাষ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠলো। একদিন এক বেলজিয়ান সাংবাদিক এসেছিল সুভাষের সাথে মোলাকাৎ করতে। সময়ের

অভাবে সেদিন সে দেখা করতে পারেনি। আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে শিগ্‌গিরই তার সাথে সুভাষের পরিচয় করিয়ে দেবো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে সুভাষের কাছে নিয়ে যেতে পারিনি। আজ সুভাষের সাফল্যের কথা শুনে সে আমাকে ভর্ৎসনা করলে। বললে: কাজটা ভালো করলে না মুখুজ্যে। নেতাজীর কাছ থেকে একটা ভালো ইণ্টারভিউ পাবো আশা করেছিলাম। সত্যি তোমরা ভারতীয়রা ভারী কথা গোপন করতে পারো।

এক সুইডিশ সাংবাদিক একদিন প্রেস ক্লাবে সুভাষকে তাচ্ছিল্য করে মন্তব্য করেছিল। জাপান থেকে যখন খবর এলো সুভাষ তার ভারতীয় বাহিনী নিয়ে ভারতের পানে এগিয়ে যাচ্ছে তখন সে আমার কাছে এসে মাপ চাইলে। বললে: সত্যি ভাই। সুভাষকে ভুল বুঝেছিলাম। লোকটা যে এতো বড়ো, মহান, তা কখনও কল্পনা করি নি।

এরপর থেকে জার্মান ও জাপানীরা আমাদের সঙ্গে বেশ সমীহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলতো। একদিন প্রেসক্লাবের সেক্রেটারী ডাঃ স্নাইজ আমাকে জড়িয়ে ধরে সবার সামনে বললেন: জানো মুখুজ্যে, তোমার দেশের প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা।

* * *

এরপর থেকে সুরু হলো ভাঙ্গনের পালা।

সুভাষের কঠোর পরিশ্রমে সমস্ত ইউরোপে গড়ে উঠেছিল আজাদ হিন্দ সংঘ। সুভাষ জাপানে চলে যাবার পর এই সংঘ ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়লো। সুভাষের অবর্তমানে সংঘের পরিচালনার ভার পড়লো নাম্বিয়ারের উপর। তার প্রধান কাজ ছিল জার্মান ও জাপানী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা।

বন্ধুদের মধ্যে কারু কারু এ বন্দোবস্ত মনঃপুত হলো না। অবশ্য তাদের মত বিভেদ আমাদের কাজের ব্যাঘাত ঘটায় নি। বরং নিত্যি নতুন আমাদের কাজের আরো উন্নতি হচ্ছিলো। এতোদিন আমরা শুধু ভারতের উদ্দেশেই আমাদের প্রচার কাজ চালাতাম। এবার থেকে আইরিশ দেশকে উপলক্ষ করে প্রচার সুরু করলাম।

*　　　　　*　　　　　*

এমনি কাজে আমরা যখন ব্যস্ত তখন হঠাৎ একদিন বিপদ ঘনিয়ে এলো বার্লিনের বুকে। এতদিন এ অঞ্চলে বোমা বর্ষন হচ্ছিলো ইলসেগুড়ির মতো কিন্তু এবার থেকে মুষলধারে বোমা বর্ষন সুরু হলো।

অক্টোবর মাস, পরিস্কার আকাশ। হঠাৎ এক রাত্রে প্রায় হাজার খানেক শত্রুর বিমান এসে বার্লিন হানা দিলে। সারা রাত্রি ধরে আক্রমন চললো। বোমার আঘাতে শহর প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। চারিদিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। একটা বোমা এসে আমার বাড়ীর সামনে পড়লো। বড়ো একটা ক্ষতির আশংকা করেছিলাম। ভেবেছিলাম যে প্রানটাও যেতে পারে। কিন্তু কপালের জোর। সে যাত্রায় প্রানটা রক্ষা পেলো।

পরদিন শহরের জীবন প্রায় অচল হয়ে উঠলো। না আছে ট্রাম না আছে কোন গাড়ী। ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে হাটাই দায়। আফিস বন্ধ। ইচ্ছে থাকলেও যাবার উপায় নেই। টেলিফোন কাজ করছে না। রেস্তরান্ত, দোকান পাট বন্ধ।

দুটো দিন প্রায় নিজের ঘরে বসে রইলাম। তারপর বন্ধুদের সন্ধান মিললো। গোল হয়ে সবাই বসলাম ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করতে। কী করা যায়। বার্লিনে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এ ভাবে এখানে থাকা অসম্ভব। মৃত্যু অনিবার্য। এ দুর্দিনে পররাষ্ট্র দপ্তরের সাহায্য মিললো। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলাম আমাদের বেতার প্রতিষ্ঠান হল্যাণ্ডের হিলভারসামে স্থানান্তরিত করা হবে। যাবার বন্দোবস্ত তারাই ঠিক করেছিলেন। রেডিও বদল করার জন্যে কিছু ইঞ্জিনিয়ারও ছিলেন।

একদিন বাক্স পেটরা গুছিয়ে নিয়ে আমরা হল্যাণ্ডের পানে রওনা দিলাম।

*　　　　　*

বার্লিন থেকে হিলভারসাম।

মৃত্যু নগরী থেকে সৌন্দর্য্যপুরীতে এলাম। শত্রুর বিমান এখনও এ অঞ্চলে বেশী উপদ্রব ঘটায়নি। এখানে মানুষের জীবন বয়ে চলেছে একটানা, মন্থর গতিতে।

আমাদের প্রধান চিন্তা কী করে আজাদ হিন্দ বেতার প্রতিষ্ঠান আবার চালু করা যায়। সঙ্গী জার্মান ইঞ্জিনিয়ারের দল কাজে ধুরন্ধর। অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের বাধা বিপত্তি দূর করে দিলেন। গড়ে উঠলো আবার বেতার ঘাঁটি। সুরু হলো আমাদের প্রচার কাজ।

* * *

আমরা এসে আশ্রয় নিয়েছিলাম হিলভারসাম শহরের এক প্রান্তে। লোকালয়ের বাইরে। এলাকার বাসিন্দাদের সাথে কোন মেলামেশা নেই বললে চলে।

তবু শহরের ভেতর রটে গেলো যে এক ভারতীয় সার্কাস দল এসেছে হিলভারসাম অঞ্চলে। অবাক হয়ে ভাবি কোথা থেকে এ উদ্ভট কাহিনীর উৎপত্তি। এমনি সময় হদিশ মিললো যে এই কাহিনীর উৎপত্তি হয়েছে আমাদের শিবির থেকে।

বন্ধু হবিবুর রহমান একদিন গিয়েছিলেন বাজারে সওদা করতে। বিস্মিত হয়ে রাস্তার লোক তার পানে তাকিয়ে ছিল। তাদের বিস্ময় মেটাবার জন্যে রহমান নিজের পরিচয় দিলে হাতীর মাহুত বলে! কাজ করে সার্কাস পার্টিতে। কিন্তু বড়োই আপশোষের ব্যাপার। আসবার সময় পথের মাঝে হাতীটা মারা গেছে।

ব্যস আর কথা নেই। বাতাসের আগে এই খবর রটে গেলো। আমরা হলাম বিস্ময়ের বস্তু, আজব চীজ! এর পর থেকে আমাদের দেখলে সবাই বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

* * *

ডাঙ্গায় মাছকে তুললে তার প্রান ছট্‌ফট্‌ করে, বার্লিন থেকে হিলভারসামে এসে আমাদেরও তেমনি অবস্থা। এ দেশের সব কিছুই নতুন। না পারি এদের ভাষা বুঝতে কিংবা নিজেদের ভাষা বোঝাতে।

গল্পে শুনেছিলাম যে প্রাচীনকালে আমাদের দেশে সবাইকে বানপ্রস্থে জীবনের একটা ভাগ কাটাতে হতো। বিংশ শতাব্দীতে এমনি নির্বাসিতের

জীবন আমাদেরও ভাগ্যে জুটবে এ কখনও কল্পনা করি নি। এখানে কিছুই করবার যো নেই। মন খুলে কারু কাছে যে দুদণ্ড কথা বলবো এমনি শ্রোতাও নেই।

তাই আমরা সবাই মিলে এক আলোচনার বৈঠক খুললাম। সেখানকার শ্রোতা ও বক্তা দুটোই আমরা। আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে কেউ কেউ তখনও বালিনে। কিছুদিন বাদে তারা আমাদের সাথে যোগ দিতে এলেন।

কয়েকদিন বাদে শীত পার হয়ে এলো বসন্ত। ইউরোপের সৌন্দর্য্যের বাগিচা হল্যাণ্ড। বসন্ত ঋতুতে এখানে প্রকৃতি তাব অবগুণ্ঠন খোলে। ধরনীর এই নতুনরূপে আমরাও যেন সতেজ হয়ে উঠলাম। দ্বিগুণ মাত্রায় আমরা কাজ করে চললাম।

ইতিমধ্যে খবর এলো ভারতের বুকে গিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ তার স্বাধীনতার ঝাণ্ডা উড়িয়েছে। সংবাদটা আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হলো। এ কী কখনও সম্ভব যে ভাবতের মাটীতে পা দিয়েছে আজাদ হিন্দ ফৌজ। দেশের মাটীতে গিযেছে সুভাষ। ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। ভাবলাম এতদিনে আমাদের স্বপ্ন সফল হলো। পবাধীনতার শৃঙ্খল থেকে আমরা মুক্ত হলাম।

রেডিওর কাছে আমরা কান পেতে বইলাম। আগ্রহের সঙ্গে শুনি কোহিমার লড়াইর বিবরনী। স্বপ্ন দেখি ভাবতীয় সৈন্যরা বিদ্রোহ করেছে। আমার দেশ পেয়েছে আজাদ, আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা।

* * *

বসন্ত পার হয়ে এলো বর্ষা।

বৃষ্টি, ঝড়ে, পর্বত-মালাব পথ হয়ে ওঠে বিপদ সঙ্কুল। ক্রমে ক্রমে আজাদ হিন্দ ফৌজেব গতি হয়ে আসে মন্থর। মরীচিকার মতো আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন মিলিয়ে যায় দূর দিগন্তে।

আঠারো

মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়া জীবনের সব চাইতে বড়ো সমস্যা। একদিন এই সমস্যাও আমাদের চিন্তিত করে তুলল। হল্যাণ্ডের এক প্রান্তে নিশ্চিন্দি মনে ছিলাম যে বোমার চোট আমাদের গায়ে লাগবে না।

কিন্তু শিগগিরই আমাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। লড়াই ক্রমেই আমাদের শহরের পানে এগিয়ে আসতে লাগল। আমরাও চিন্তিত হয়ে উঠলাম।

পূর্ব অঞ্চলে তখন জার্মান সেনাপতির অদল বদল হয়েছে। রোমেলের জায়গায় এসেছেন জেনারেল ফন ক্লুগ। আর আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর নেতা হলেন জেনারেল প্যাটন। হিটলার রুশ প্রান্তে লড়াইর তত্ত্বাবধান নিজে করছেন। এমনি সময়ে একদিন খবর এল প্যাটন জোর আক্রমণ চালিয়েছেন।

হিটলারের শিবিরে ফন ক্লুগের তলব হল।

*　　　　*　　　　*

লড়াইর পরিস্থিতি জানিয়ে ফন ক্লুগ বললেন: অবস্থা সঙ্কটজনক। এ অবস্থায় পশ্চাদপসরণই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু ক্লুগের প্রস্তাব হিটলার মানতে রাজী নন। পশ্চাদপসরণ কোন প্রকারেই নয়। মৃত্যু এর চাইতে শ্রেয়ঃ। অতএব ক্লুগের প্রতি আদেশ হল প্রতিআক্রমণ চালাও।

বিস্মিত, হতভম্ব ক্লুগ, আদেশ শুনে কী করবেন ভেবে পেলেন না। তার কাছে প্রতি আক্রমণ মানে জুয়ো খেলা। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তবু অন্য পথ নেই, হিটলারের আদেশ তাকে মানতেই হবে।

অনিচ্ছার সঙ্গেই ক্লুগ প্রতিআক্রমণ চালালেন। কিন্তু সে আক্রমণ ব্যর্থ হল। প্যাটনের আক্রমণের কাছে ক্লুগকে মাথা নত করতে হল।

আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে, খবরটা শুনে হিটলার রেগে গেলেন। ক্লুগের জন্যই এই আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে হিটলার বলেন। কাপুরুষ ক্লুগ।

কিন্তু চীৎকার করে লড়াই জেতা যায় না। হিটলারও পারলেন না। মিত্রশক্তির আক্রমণের কাছে জার্মান প্রতিরোধ ব্যর্থ হল।

একদিন সকালবেলা চিন্তিত হয়ে হিটলার যুদ্ধপ্রান্তে ক্লুগকে টেলিফোন্ করলেন। জানতে চান লড়াইর পরিস্থিতি। কিন্তু ক্লুগের শিবির থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই। নিঃঝুম, নিস্তব্ধ। শঙ্কিত হয়ে উঠলেন হিটলার। তবে কী ক্লুগ আত্মসমর্পণ করেছেন।

হিটলার আর দেরী করলেন না। সেই মুহূর্তেই ক্লুগকে বরখাস্ত করলেন। আদেশ দিলেন জেনারেল মডেলকে ক্লুগের হাত থেকে লড়াই পরিচালনার ভার নিতে।

ব্যাপারটা কিন্তু হয়েছিল ঠিক উল্টো। ক্লুগ আত্মসমর্পণ করেন নি কিন্তু টেলিফোন লাইন খারাপ হবার দরুন হিটলার তার সঙ্গে কথা বলতে পারেন নি।

হিটলারের আদেশ শুনে ক্লুগ আত্মহত্যা করলেন। মরবার আগে হিটলারকে অনুরোধ করলেন : লড়াই শেষ করুন, নইলে জার্মানীর ধ্বংস অনিবার্য।

* * *

কয়েকদিনের মধ্যে প্যারী জার্মানদের হাতছাড়া হয়ে গেলো। আমেরিকান জেনারেল প্যাটন তার দলবল নিয়ে মোজেল নদী পার হয়ে বার্লিনের পানে এগিয়ে আসতে লাগলেন। ইংরেজ জেনারেল মণ্টোগোমারীও পেছুতে নেই। আনটওয়ার্প, ল্যুভেন দখল করে তিনিও এগিয়ে আসছেন।

সেনাপতিদের নিয়ে হিটলার আলোচনা শুরু করেন। পরাজয়ের প্লাবন বন্ধ করতে হবে। কী করে করা যায়, এইটেই গবেষণার বিষয়।

আলোচনার সময় এক বিভ্রাট ঘটলো। এক সেনাপতি আপত্তি করে

বললেন পূর্বাঞ্চলের লড়াই ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে উঠছে। এ অঞ্চলে আরো সৈন্য চাই।

ব্যস আর কথা নেই। কথাটা শেষ হবার আগেই হিটলার চীৎকার করে উঠলেন। ভালো মন্দের বিচারক তিনি। এ কাজের দায়িত্ব তিনি সৈন্যদের হাতে দিতে চান না।

'কী ভালো কী মন্দ, তার বিচার করবো আমি। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে আমি একমনে দেশের সেবা করেছি। আমোদ, স্ফূর্তি কিছুই করি নি। শুধু লড়াইর পরিচালনা করেছি। কারণ আমার প্রতিজ্ঞা, হয় যুদ্ধে জয়লাভ করবো নয় মৃত্যুকে বরণ করে নেবো। কঠোর সংকল্প না থাকলে কখনই যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না। কিন্তু আমার সেনাপতিরা কাপুরুষ। তারা যুদ্ধকে ভয় পায়। সৈন্যদের উৎসাহ দেবার বদলে সবাইকে নিরুৎসাহ করে'।

হ্যাঁ যদি প্রয়োজন হয়, তবে রাইন নদীর তটে আমরা সংগ্রাম করবো, মৃত্যুকে আমি ভয় পাইনে। এ সংগ্রাম আমি চালিয়ে যাবো যতদিন না শত্রু ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

* * *

কিছুদিনের মধ্যেই জার্মান বাহিনীর মধ্যে সৈন্যর অভাব দেখা দিলে। তাই হিটলার হুকুম দিলেন সৈন্য রিক্রুট করবার জন্যে। এ লড়াইতে বিস্তর লোকের ক্ষতি হয়েছে। প্রায় দশ লাখের কাছাকাছি।

নতুন সৈন্যর সাথে সাথে চাই অস্ত্র, গোলা বারুদ। অবশ্যি এ ব্যাপারে জার্মানীর বরাত ভালো। লড়াইতে গোলা বারুদ বানাবার কাজকর্মের কোন ব্যাঘাত ঘটে নি। ফ্যাক্টরীর কাজ বেশ পুরোদমেই চলছে। এ কাজের উপর হিটলার এবার নজর নিলেন।

হুকুম হলো আরো অস্ত্র চাই—চাই গোলা বারুদ।

* * *

কয়েকদিন বাদে জেনারেল জডলকে নিয়ে হিটলার গোপনে পরামর্শ করতে বসলেন। একটা চমকপ্রদ কিছু করতে হবে যাতে সবার তাক লেগে

যায়। মতলবটা আর কিছু নয়, পূর্ব অঞ্চলে এক নতুন আক্রমণ চালাতে হবে। তাই নিয়ে জডলের সাথে আলাপ আলোচনা।

দীর্ঘ পাঁচ বছর আগে জেনারেল ম্যানস্টাইনের সাহায্যে হিটলার এ অঞ্চলে এক চাঞ্চল্য এনেছিলেন। আজ তিনি আবার আর এক আলোড়ন সৃষ্টি করতে চান।

অনেক ভেবে চিন্তে হিটলার ঠিক করলেন যে তিনি আবার আর্দেনস পাহাড় পর্বতের ভেতর দিয়ে আক্রমণ চালাবেন। আর্দেনসের ভেতর দিয়ে সোজা পথ গেছে আণ্টওয়ার্পের পানে। একবার এই পথ ধরতে পারলে আণ্টওয়ার্পে পৌছানো মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। কারণ আণ্টওয়ার্পে মিত্র শক্তি বিশেষ দুর্বল। না আছে সেখানে সৈন্য না আছে রসদ।

এ আক্রমণের ভার পড়লো জেনারেল রুনস্টেডের উপর।

* * *

চুয়াল্লিশ সালের ডিসেম্বর মাস।

হিটলারের শিবিরে বড়ো বড়ো সেনাপতিদের তলব হয়েছে। কনফারেন্সে যোগ দিতে এসেছেন, রুনস্টেড, মডেল প্রভৃতির দল।

কনফারেন্সে যাবার আগে সব সেনাপতিদের বেশ ভালো করে খানাতল্লাসী করা হলো। বিশ্বাস নেই কাউকে। স্টাউফেনবার্গের কীর্তি এখনও সবার মনে রঙ্গীন হয়ে আছে।

জেনারেল কাইটেল ও জেনারেল জডলকে নিয়ে হিটলার কনফারেন্সে এলেন। নতুন আক্রমণ শুরু হবে। তাই নিয়ে কল্পনা জল্পনা।

বক্তৃতা শুরু হলো—শুরু হলো চোখ রাঙ্গানী। হিটলার বললেন: আমাদের একদিকে ক্যাপিটালিষ্ট বাহিনী, অপর প্রান্তে মার্কসের অনুচর। ইংরেজকে কাবু করে আমেরিকা চাইছে পৃথিবীর নেতা হতে। রুশ দেশ চাইছে বল্কান রাজ্যগুলো দখল করতে। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য এদের সবার উদ্দেশ্য বানচাল করা। আত্মসমর্পন, অসম্ভব, কখনই না।

বক্তৃতা শেষে হিটলার রুণষ্টেডের হাতে একটা সিলমোহর কাগজ দিলেন।

এতে আছে আক্রমণের নকসা। তার উপরে হিটলারের নিজের হাতে লেখা : এই নকসার অদলবদল নিষেধ।

নিজের হাতে সব কিছু করার জন্যে হিটলার তার ছাউনী পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্তে নিয়ে এলেন।

* * *

রুণষ্টেডের এই আক্রমণ যুদ্ধের ইতিহাসে স্মরণীয়। জার্মানবাহিনীর আক্রমণের তেজে মিত্রশক্তির বাহিনী অল্পদিনের মধ্যে বিপর্যস্ত হয়ে উঠল।

* * *

ব্যাঁস্টো দি হেল।

আর্দেনসের পর্বতের এক পাশে এক গ্রাম, ব্যাঁস্টো। বেলজিয়াম থেকে লাক্সেমবুর্গে যাবার পথ।

এইখানে এসে রুণষ্টেড তার দলবল নিয়ে দাঁড়ালেন। মিত্রশক্তির সাথে একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া করতে হবে।

মিত্রশক্তির অধিকাংশই আমেরিকান বাহিনী। তাদের সেনাপতি হলেন জেনারেল প্যাটন।

রুণষ্টেডকে রুখতে গিয়ে এ অঞ্চলে আমেরিকানদের জীবন নরককুণ্ড হয়ে দাঁড়াল। খাঁচার ভেতর এদের পেয়েছেন রুণষ্টেড। বেরুবার যো নেই, চারদিকে জার্মানবাহিনী। আক্রমণের বেগ দেখে সবাই বলতে লাগল, ব্যাঁস্টো দি হেল। এ লড়াইতে হাজার হাজার আমেরিকান প্রাণ দিলে। মিত্রশক্তির বড়োকর্তারা চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু রুণষ্টেডের ভাগ্য ছিল খারাপ। নিত্যি নতুন হিটলারের শিবির থেকে আদেশ আসে। এখানে আক্রমণ করো, ওদিক থেকে সৈন্যবাহিনী হটাও। হিটলারের খামখেয়ালীর জন্যে মস্কাউর লড়াইতে জার্মানবাহিনীকে মাথা নত করতে হয়েছিল। সেই কারণে আজ আর্দেনসে তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হল। হার মেনে নিলেন রুণষ্টেড। এমনি করে জার্মানীর জেতবার শেষ আশাটুকুও নিভে গেলো।

*　　　　*　　　　*

কয়েকদিন বাদে রুশ বাহিনীও জার্মানীর দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত।

এ অঞ্চলে জার্মান সৈন্যবাহিনীর পরিচালনার ভার ছিল জেনারেল গুডেরিয়ানের উপর। এবার তিনি নতুন দাবী নিয়ে হিটলারের কাছে এলেন। বললেন, সৈন্যদের অস্ত্র নেই, বস্ত্র নেই। শীতে তারা মরছে। এ সব না হলে রুশদের আক্রমণ রোখা অসম্ভব।

প্রতিদিনই গুডেরিয়ানকে হিটলারের ধমক শুনে ফিরে যেতে হয়। নিরাশ হয়ে গুডেরিয়ান ফিরে আসেন। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, তিনি হলেন নিধিরাম সর্দার। কী করে তিনি লড়াই করবেন?

এদিকে দারুণ শীতে জার্মান সৈন্যবাহিনীর জীবন অসহ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু কিছুই করবার যে নেই। তার উপর হিটলারের কঠোর আদেশ, পশ্চাদপসরণের দণ্ড মৃত্যু।

দেশদ্রোহীর স্থান জার্মানবাহিনীতে নেই।

*　　　　*　　　　*

যুদ্ধের হালচাল দেখে নাৎসী কর্তারাও এবার একটু চিন্তিত হলেন। পরাজয় সন্নিকটে, এটা বুঝে নিতে অসুবিধা হল না। তাই সবাই মিলে পরামর্শ শুরু করলেন কী করে ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

গোয়েবলসের প্রস্তাব, যদি নাৎসী দল ধ্বংস হয় তবে জার্মানীর সব কিছুই ধ্বংস করতে হবে। প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সব কিছুই।

গোয়েবলসের প্রস্তাবে হিটলার পূর্ণ সায় দিলেন। দেশের প্রয়োজনীয় সব কিছু ধ্বংস করার ভার দেওয়া হল স্পিয়ারের উপর।

একদিন হিটলার স্পিয়ারকে ডেকে পাঠালেন। বললেন: লড়াইতে জার্মানীর পরাজয়ের মানে হল সমস্ত জার্মান জাতির নিশ্চিহ্ন হওয়া। তাই সময় থাকতে সবকিছু ভেঙ্গে ফেলতে হবে, যাতে শত্রুর হাতে কোন কিছুই না পড়ে।

হিটলার বলতে থাকেন: ফ্যাক্টরী, ব্রিজ সব উড়িয়ে দিতে হবে। এক

কথায় জার্মান দেশকে মাটির ঢেলায় পরিণত করতে হবে। এ আদেশ যে অমান্য করবে তার শাস্তি মৃত্যু।

হিটলারের আদেশ সত্ত্বেও স্পিয়ার এ কাজে গাফিলতি দিতে লাগলেন।

গা ঢিলে দিয়ে কাজ শুরু করলেন। ফলে যা হবার তাই। হিটলারের উদ্দেশ্য সফল হল না। জার্মান দেশ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেলো।

* * *

ইতিমধ্যে রুশবাহিনী ঝড়ের বেগে কোয়েনিসবার্গ কেড়ে নিলো। কয়েকদিন বাদে ভিয়েনাও হিটলারের হাত ছাড়া হয়ে গেল। সেনাপতিদের নিত্যি কনফারেন্সে তলব করে হিটলার ধমক দেন। কিন্তু গালিগালাজ, দোষারোপের একই ফলাফল—অর্থাৎ পশ্চাদপসরণ।

ইতিমধ্যে হিটলারের ব্যক্তিগত জীবনেরও বহু পরিবর্তন হয়েছে। ঘুম নেই, খাওয়া নেই, সদা সর্বদাই তাকে কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই তার মনটা ব্যাজার হয়ে থাকে। এর উপর প্রতিদিন আসছে লড়াইর দুঃসংবাদ। পুরানো বন্ধুদেরও তিনি আর বিশ্বাস করতে পারছেন না।

গোয়েরিং-এর উপর তিনি বিশ্বাস হারিয়েছেন, হিমলারের প্রতিপত্তিও দিন দিন কমছে।

এছাড়া যুদ্ধপ্রান্তে হিমলার লড়াইর কর্তৃত্ব নিয়েছেন। তার দরুন তাকে হিটলারের শিবির থেকে দূরে থাকতে হয়। তার পুরানো শত্রু বোরম্যান এই অনুপস্থিতির সুযোগ নেন। হিটলারের কানে তিনি নিত্যি নতুন হিমলারের নামে ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে থাকেন। তার জন্যে আজ এত দুর্গতি। কয়েকদিনের মধ্যে বোরম্যান হিটলারের মন হিমলারের উপর বিষিয়ে দিলেন।

* * *

আর এক পুরানো বন্ধু ডাঃ গোয়েবলস।

ভাগ্যের তারকা খুলেছে প্রচার বিশারদ গোয়েবলসের। জীবনের প্রথম অধ্যায়ে তিনি হিটলারের বিরোধিতা করে এসেছিলেন। কিন্তু

আজ অবস্থার হয়েছে হেরফের। আজ তিনি হয়েছেন হিটলারের ডান হাত।

ভিয়েনা পতনের পর গোয়েবলসের চিন্তা সত্যিই বাড়ল। হিটলারের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস। বলতে গেলে তার হাতেই তিনি জীবন সঁপে দিয়েছেন।

জার্মানবাহিনীর পরাজয় দেখে গোয়েবলস ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে বসলেন। দেখতে হবে 'ফ্যুরার'-এর ঠিকুজি, দেখতে হবে জার্মান জাতির ভবিষ্যৎ। ঠিকুজি এল। সব দেখে গোয়েবলস বললেন, না ভাবনার কিছু নেই। আমাদের দুশ্চিন্তা শিগগিরই কেটে যাবে। কয়েকটা দিন পরাজয় আছে অবশ্যি কিন্তু এর পরেই জয়, তারপরেই সন্ধি।

* * *

লড়াইর পরিস্থিতি নিয়ে একদিন হিটলার, গোয়েরিং ও জডলকে নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ইংরেজ ও আমেরিকান বাহিনীর আসল মতলবটা কী তিনি বুঝতে পারছেন না। সত্যিই কী তারা জার্মানদের পরাজয় চায়? সত্যিই তারা দেখতে চান হিটলারের পতন আর রুশ বাহিনীর সাফল্য? হিটলার মনে মনে ভাবেন।

আচ্ছা গোয়েরিং, আমেরিকানদের কাণ্ডটা দেখেছো। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ। আমাদের পরাজয় হলে কম্যুনিজমের যে জয়-জয়কার এটা কী ওরা জানে না। আশ্চর্য! হিটলার বলেন।

গম্ভীর হয়ে জবাব দেন গোয়েরিং। জয়ের আশা তখনও তার মন থেকে নিভে যায় নি। বলেন: আমেরিকানরা কখনই কল্পনা করে নি যে আমরা ওদের রুখতে পারবো না। ভাবতে পারে নি এতো দ্রুতগতিতে রুশবাহিনী জার্মানীর পানে এগিয়ে আসবে।

আলোচনায় এবার যোগ দেন জডল। বলেন: আমেরিকা ও রুশিয়ার মধ্যে তো অহি-নকুল সম্পর্ক। চিরকালই তো আমেরিকান সরকার রুশদের সন্দেহের চোখে দেখে এসেছে।

হিটলার চুপ করেন। গোয়েরিং ও জডলের কথাটা শোনেন। তারপর একটু ভেবেচিন্তে বলেন : জানো, আমি এক মতলব ফেঁদেছি! গুপ্তচর মারফৎ ইংরেজদের কাছে খবর পাঠাচ্ছি যে রুশবাহিনী জার্মানদের কম্যুনিজমের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে। আমি হলপ করে বলতে পারি যে এ খবরটা পেলে ইংরেজ, আমেরিকান সরকার শঙ্কিত হয়ে উঠবে।

এ প্রস্তাবে সায় দিলেন গোয়েরিং। বললেন : আমরা যাতে রুশদেশ দখল না করতে পারি তার জন্তেই তো ইংরেজ, আমেরিকানরা বাধা দিচ্ছে। কিন্তু রুশবাহিনী এসে যে জার্মানী দখল করতে পারে এটা ইংরেজ আমেরিকানদের কল্পনার বাইরে। তাই ওদের মনে একটু ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার।

হিটলার যখন গোয়েরিং জডলের সাথে এই আলোচনা করছেন, তখন মিত্রশক্তির কর্তারা ইয়ালটাতে এক বৈঠকে লড়াইর পরিস্থিতি নিয়ে কথাবার্তা বলছেন।

মিত্রশক্তির ভেতর বহু বাধা বিপত্তি দেখা দিয়েছে। তারই একটা মীমাংসার প্রয়োজন। নইলে জয় অসম্ভব।

নিজেদের ঝগড়া মেটাতে মিত্রশক্তির বেশী দেরী হলো না। রুজভেল্ট চার্চিল, স্টালিন তাদের বন্ধুত্বকে আরও পাকাপোক্ত করলেন। ভুলে গেলেন তাদের দলাদলি। তিন নেতাই একমত, জার্মানীর পূর্ণ আত্মসমর্পণ চাই। নইলে কোন সন্ধির প্রস্তাবই গ্রাহ্য করা হবে না।

কিন্তু কয়েকদিন বাদেই এল এক দুঃসংবাদ।

খবর এল প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট মারা গেছেন।

খবরটা মিত্রশক্তির কাছে দুঃসংবাদ, জার্মানীর কাছে সুখবর। রুজভেল্ট ছিলেন মিত্রশক্তির একজন প্রধান কর্মকর্তা। তার মৃত্যু সত্যি অপূরণীয় বটে। তাই মিত্রশক্তির নেতারা ভবিষ্যৎ নিয়ে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

আর জার্মানী।

নিজের ঘরে বসে গোয়েবলস রেডিও শুনছিলেন। এমনি সময় রুজভেল্টের

মৃত্যু খবর শুনতে পেলেন। প্রথমে খবরটা বিশ্বাস করতে পারলেন না। রুজভেল্ট মারা গেছেন। এ যে অবিশ্বাস্য সংবাদ। কিন্তু একটু বাদে আবার রেডিওর ঘোষক সজোরে জানালে যে রুজভেল্টের মৃত্যুর খবর সাচ্চা অর্থাৎ এতে মিথ্যার একটু রেশ নেই।

এবার গোয়েবলস আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। না, হিটলারের ঠিকুজি দেখতে তিনি ভুল করেন নি। জয় এবার অনিবার্য। যত বাধার মূলে ছিলেন রুজভেল্ট। আনন্দের চোটে গোয়েবলস মদের বোতল খুলে বসলেন। রুজভেল্টের মৃত্যু এ নিয়ে একটু উৎসব করতে হবে বৈ কী?

একটু বাদে গোয়েবলস হিটলারকে টেলিফোন করে সংবাদটি জানালেন। 'মাইনে ফ্যুরার'—আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আমাদের জয় অনিবার্য।

বিস্মিত হয়ে হিটলার প্রশ্ন করেন—কী ব্যাপার। তিনি ভাবেন তার প্রচার বিশারদের হয় তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নইলে জার্মানীর এই দুর্দিনে কেউ তাকে অভিনন্দন জানাতে পারে।

গোয়েবলস বলেন: ফ্যুরার, আমেরিকান প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট মারা গেছেন। এবার আমাদের জয় সুনিশ্চিত।

এবার হিটলারের বিস্ময়ের পালা। রুজভেল্ট মারা গেছেন কথাটা সত্যিই অবিশ্বাস্য বটে। তাহলে জেতবার আশা এখনও নিভে যায় নি—হিটলার ভাবেন।

*　　　　　*

কয়েকদিন বাদেই হিটলার বুঝতে পারলেন যে জেতবার আশা শুধু মাত্র মরীচিকা। পরাজয়ের প্লাবন আটকাবার ক্ষমতা হিটলারের নেই।

চারদিক থেকে মিত্রশক্তির বাহিনী বার্লিনের পানে এগিয়ে আসতে লাগল। বিপদ ঘনিয়ে এল বার্লিনের পানে।

এমনি দুর্যোগের সময় একদিন হিটলারের বান্ধবী এভা ব্রাউন এসে উপস্থিত।

এসে হিটলারকে বললে : আমি তোমার সঙ্গে থাকবো।

হিটলার তাকে বোঝান জার্মানীর বিপদ ক্রমেই বাড়ছে। এ অবস্থায় এখানে থাকা মৃত্যু অবধারিত।

এভা ব্রাউন জবাব দেয় : তবে চলো বার্লিন ছেড়ে অন্য কোথাও যাই।

হিটলার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ অবস্থায় তারপক্ষে বার্লিন ত্যাগ একেবারেই অসম্ভব।

এভা ব্রাউনেরও এক গোঁ। যেখানে হিটলার সেখানেই তার স্থান।

* * *

এপ্রিল মাসের বিশ তারিখ।

আজ হিটলারের জন্মদিন।

সারাদিন ধরে নাৎসীদলের কর্তারা এসে হিটলারকে জন্মদিনের শুভকামনা জানালেন। বিকেল নাগাদ হিটলার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে এক বৈঠকে বসলেন। গোয়েরিং, গোয়েবলস, রিবেনট্রপ, বোরম্যান, হিমলার, স্পিয়ার সবাই এই বৈঠকে আছেন। সবাই হিটলারকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, বার্লিনের বিপদ ঘনিয়ে আসছে। এ সময়ে রাজধানী এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

বন্ধুদের দাবী হিটলার অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিলেন। রাজধানী অন্যত্র যাক, তার আপত্তি নেই কিন্তু তিনি নিজে কোথাও যাবেন না। মরতে হয়, বার্লিনেই তিনি মরবেন।

এবার ঠিক হল যে জার্মান হাই কম্যাণ্ড দুটো অংশে ভাগ হবে। এক অংশের কর্তৃত্ব নেবেন এডমিরাল ডোয়েনিৎজ অপর অংশের দায়িত্ব নিলেন জেনারেল কেসারলিং।

পরদিন সকালে হিটলার সৈন্যবাহিনীর কর্তাদের তলব করলেন। রুশ-বাহিনী বার্লিন আক্রমণ আরম্ভ করেছে। এদের আক্রমণের প্রতিরোধ করতে

হবে। সৈন্যবাহিনীর কাছ থেকে তিনি দ্বিধা বা সংকোচ সহ্য করবেন না। প্রয়োজন হলে সবাইকে এই শহরের জন্যে প্রাণ দিতে হবে।

কিন্তু রুশ বাহিনীর বার্লিন আক্রমণ রুখতে পারা গেলো না। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তারা শহর ভেদ করে ঢুকলো। শত্রুর সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করলে জেনারেল স্টেনার। কিন্তু তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। বার্লিনের বুকে উঠলো রুশ বাহিনীর ধ্বজা।

* * *

আবার বসলো হিটলারের শিবিরে সৈন্য বাহিনীর বড়ো কর্তাদের বৈঠক।

এবার প্রথম থেকেই হিটলার সেনাপতিদের গালি-গালাজ শুরু করলেন। কাপুরুষ, ভীরু, অপদার্থ—আজ তাদের জন্যেই জার্মানীর পরাজয় হচ্ছে। ভীরুর দল যদি চায় তবে তারা বার্লিন ত্যাগ করে যেতে পারে। তার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি বার্লিনের জন্যে প্রাণ দেবেন।

হিটলারের সংকল্পের কথা গেলো হিমলারের কানে। তিনি দৌড়ে এলেন ফ্যুরারের কাছে।

বার্লিনে থাকা পাগলামি। এ শহরের পতন অবশ্যম্ভাবী। হিমলারের সঙ্গে সঙ্গে এলেন এডমিরাল ডোয়েনিৎজ। তারও একই অনুরোধ। বার্লিনে থাকা আর এক মুহূর্তও উচিত নয়—এডমিরাল ডোয়েনিৎজ বলেন।

কিন্তু হিটলারের সংকল্পের কোন অদল বদল নেই। গোয়েবলসকে ডেকে আদেশ দিলেন : আমি বার্লিনে থাকবো—এ কথাটা যেন সবাইকে রেডিও মারফৎ জানানো হয়।

গোয়েবলস দেশবাসীকে জানালেন হিটলারের সংকল্পের কথা।

* * *

দুদিন বাদে জেনারেল কাইটেল ও জেনারেল জডল বার্লিন ত্যাগ করে চলে গেলেন। ঠিক হয়েছে এবার বার্লিনের বাইরে থেকে হাই কম্যাণ্ডের কাজ কর্ম করা হবে। এর পরে গেলেন গোয়েরিং। গোয়েরিং-এর সঙ্গ নিলেন

হিটলারের চিকিৎসক ডাঃ মোরেল। বার্লিনে এ মুহূর্তে থাকা যে বিপদজনক এটা বুঝতে মোরেলের অসুবিধে হয় নি।

এমনি করে রাজধানী থেকে নাৎসী দলের কর্তারা সব সরে পড়তে লাগলেন। শুধু মাত্র বোরম্যান ও গোয়েবলস হিটলারের সঙ্গে রইলেন।

যাবার আগে স্পিয়ার হিটলারের সাথে দেখা করতে এলেন। বার্লিন ধ্বংস করার আদেশ হিটলার স্পিয়ারকে দিয়েছিলেন, কিন্তু স্পিয়ার সে আদেশ পালন করেন নি। আজ বিদায় নেবার আগে স্পিয়ার হিটলারকে জানালেন যে তার পক্ষে বার্লিন ধ্বংস করা সম্ভব হয় নি।

স্পিয়ারের কথা শুনে আজ হিটলার চুপ করে রইলেন। স্পিয়ারকে হিটলার সত্যি সত্যিই ভালোবাসতেন। তাই তাকে না লাগালেন ধমক, না করলেন গালি-গালাজ। শুধু বললেন : বার্লিন ত্যাগ করে আমি কোথাও যাবো না। তুমি যেতে চাইছো যাও, আমার কোনো আপত্তি নেই।

হিটলারের পরিবর্তন দেখে আজ স্পিয়ার বিস্মিত হলেন। অবাক কাণ্ড। যার হুংকারে একদিন সমস্ত পৃথিবী কাঁপতো, পৃথিবীর নেতারা আতঙ্কিত হতেন, আজ তিনি নির্বাক। কী ব্যাপার।

স্পিয়ার কারণ খুঁজে পেলেন না।

কারণ একটা ছিলো যা স্পিয়ার জানতেন না।

চারদিক থেকে জার্মানীর যখন বিপদ ঘনিয়ে আসছে তখন হিটলার মনে মনে বুঝতে পারলেন পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। বাইরে এ কথাটি প্রকাশ করেন নি কিন্তু মনে মনে জানতেন সে ধ্বংসের হাত থেকে জার্মানীর নিষ্কৃতি নেই। বিপদ দেখে আজ তাঁকে অতীতের বন্ধুরাও ত্যাগ করে যাচ্ছে। এর আভাস হিটলার পেলেন কিছুদিনের মধ্যে।

গোয়েরিং-এর কাছ থেকে তিনি একখানা চিঠি পেলেন। সংক্ষিপ্ত চিঠি কিন্তু তীব্র তার ভাষা। গোয়েরিং হিটলারকে জানিয়েছেন যে জার্মানীর এই

সঙ্কটে সন্ধিই বুদ্ধিমানের কাজ। যদি হিটলারের আপত্তি না থাকে তবে এই পরিস্থিতিতে গোয়েরিং নিজের হাতে জার্মানীর শাসনভার নেবেন।

গোয়েরিং-এর চিঠি পড়ে হিটলার রেগে গেলেন। সন্ধির প্রস্তাব করেছে গোয়েরিং! দেশদ্রোহী গোয়েরিং। কাপুরুষ, বিপদকে তার ভয়।

সামনেই বোরম্যান দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুযোগ বুঝে তিনিও হিটলারের কাছে গোয়েরিং-এর নামে অনেক কিছু লাগালেন। হিটলার আদেশ দিলেন যে গোয়েরিং-এর শাস্তি হবে মৃত্যু।

* * *

গোয়েরিং-এর স্থান দেয়া হলো রিটার ফন গ্রাইমকে। অর্থাৎ তিনি হলেন এয়ার ফোর্সের কর্তা।

বার্লিনের বাইরে তখন তুমুল যুদ্ধ চলছে। শহরে ঢুকতে হলে শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে আসতে হয়।

হিটলার গ্রাইমকে এই বিপদের মধ্যে ডেকে পাঠালেন।

শহরে ঢোকার বহু ঝঞ্ঝাট। তবু ফন গ্রাইম হিটলারের আদেশ অমান্য করলেন না। হানা রিৎস বলে একটি মেয়ে পাইলটের সাহায্য নিয়ে তিনি হিটলারের শিবিরে এলেন।

আসতে গিয়ে শত্রুর গুলি বেশ খানিকটা হজম করতে হলো।

গ্রাইমকে দেখে হিটলার মহাখুশি।

বললেন : জানো গ্রাইম, তোমাকে কেন ডেকে পাঠিয়েছি।

কেন? বিস্মিত হয়ে গ্রাইম জিজ্ঞেস করেন।

দেশদ্রোহী গোয়েরিংকে বরখাস্ত করেছি। তার জায়গায় তোমাকে প্রমোশন দিয়েছি।

হিটলারের কথা শুনে গ্রাইম তো অবাক। সামান্য কথা—এ বলবার জন্যে হিটলার তাকে বার্লিনে তলব করেছেন। আশ্চর্য!

* * *

এর পর হানা রিৎসের সাথে অভিনয় শুরু হলো। হানাকে দেখে হিটলার বললেন : হানা, আমার সেনাপতির দল সব কাপুরুষ, ভীরুর দল। তাদের জন্যেই আজ জার্মানীর এই দুর্দশা। আমার সাথে তারা প্রতারণা করছে।

বলতে বলতে হিটলারের চোখে জল গড়িয়ে পড়ল।

সেদিন রাত্রে হিটলার হানাকে এক শিশি বিষ পাঠালেন। বলে পাঠালেন, এই বিষের শিশি তোমার জন্যে। শত্রুর হাতে পড়ার চাইতে এটা খাওয়া অনেক ভালো।

বিষের শিশি পেয়ে হানা তো অবাক। এসেছিলেন হিটলারকে দেখতে আর এখন কি না তাকে মরতে বলা হচ্ছে।

হানার মনের কথা হয়তো হিটলার বুঝতে পারেন। বলেন : ভয় পেয়োনা হানা। জেতবার আশা এখনও আছে। জার্মান সৈন্যবাহিনীরা এখনও আত্মসমর্পন করে নি।

হানার সাথে কথাবার্তা শেষ করে হিটলার বিশ্রাম করতে পাশের ঘরে গেলেন।

সামনেই এভা ব্রাউন দাঁড়িয়ে ছিলো।

অনুযোগের কণ্ঠে বললে : পুয়োর এডলফ! বন্ধুরা সবাই তার সাথে প্রতারণা করেছে। বিশ্বাসঘাতকের দল।

এপ্রিল মাসের ছাব্বিশ তারিখ।

গভীর রাত্রে কামানের গর্জনে বার্লিন শহর কেঁপে উঠলে। রুশ বাহিনীর কামানের গর্জন।

যুদ্ধের পরিস্থিতি হিটলার এখন সঠিক কিছু জানেন না। শহরের চারদিকে বিক্ষিপ্ত লড়াই ঘটছে। সঠিক খবর জানবার কোনো উপায় নেই। বিশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী।

*   *   *

এমনি বিপদের ভেতর হিটলারের বিশ্বস্ত অনুচর হিমলার গেলেন সুইডিশ দূতাবাসে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে।

সুইডিশ রেডক্রশের নেতা কাউন্ট বার্নাডোট এসেছেন সুইডিশ কনসুলাটে। হিমলার তার সাথে দেখা করতে গেলেন। যাবার আগে হিটলারকে কিছুই বলে গেলেন না। কারণ তার দৃঢ় ধারণা যে হিটলার মারা গেছেন। আর যদি মারা না গিয়েও থাকেন তবে কয়েকদিনের মধ্যেই মারা যাবেন।

হিমলার কাউন্ট বার্নাডোটের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করলেন। বললেন, জার্মানীর বিপদ ঘনিয়ে আসছে। অতএব যতো শিগগির পারা যায় লড়াই শেষ করা দরকার।

আমেরিকানদের কাছে মাথা নত করতে আপত্তি নেই কিন্তু রুশ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন, অসম্ভব—হিমলার বলেন।

হিমলারের প্রস্তাব কাউন্ট বার্নাডোট চুপ করে শুনলেন। কোন মন্তব্য করার ক্ষমতা তার নেই। কারণ এ প্রস্তাব গ্রহণ করার দায়িত্ব হলো মিত্রশক্তির। তিনি হলেন সংবাদবাহক।

* * *

বার্নাডোট খবর পাঠালেন চার্চিল ট্রুম্যানের কাছে।

সন্ধির প্রস্তাব করেছে জার্মান বাহিনী। ইংরেজ আমেরিকানের কাছে মাথা নত করতে আপত্তি নেই কিন্তু রুশদের কাছে আত্মসমর্পন অসম্ভব।

স্পষ্ট জবাব এলো বিনা সর্তে আত্মসমর্পন, নতুবা ধ্বংস। রাজী ?

মিত্রশক্তির জবাব শুনে হিমলার হতভম্ব। এমনি ভাবে যে নিরাশ হতে হবে এ তিনি কখনও কল্পনা করেন নি। একেই বলে ভাগ্য! নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন তার শিবিরে।

* * *

বাতাসের আগে সংবাদ রটে যায়।

হিমলারের সন্ধির প্রস্তাব বেশীদিন চাপা রইলো না।

বেশ ফলাও করে ইংরেজ, আমেরিকান সরকার এ সংবাদটা প্রচার করলে। আর রেডিওর পাশে বসে হিটলার সেই সংবাদ শুনলেন।

প্রথমে হিটলার কথাটা বিশ্বাস করতে পারলেন না। এ কী সম্ভব! তারই বিশ্বস্ত অনুচর, তারই অজ্ঞাতসারে গিয়েছে মিত্রশক্তির কাছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে। অসম্ভব! কল্পনার অতীত।

বোরম্যান, গোয়েবলস ছিলেন হিটলারের সাথে। হিটলার হিমলারের কার্যকলাপ নিয়ে এবার এদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। বিশ্বাসঘাতক হিমলার। মিত্রশক্তির কাছে যাবার আগে গোয়েরিং অবশ্যি হিটলারের অনুমতি চেয়েছিলেন কিন্তু হিমলার তাও করেন নি।

ব্যাপারটা ভালো করে জানবার জন্যে হিমলারের পার্শ্বচর ফেগলাইনকে গ্রেপ্তার করা হলো। ফেগলাইন হিমলারের কার্যকলাপের পুরো খবর রাখতেন। তাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা হলো। তারপর সাজা হলো মৃত্যুদণ্ড।

হিমলারের প্রতি আদেশ হলো মৃত্যুদণ্ড। বিশ্বাসঘাতকের যা শাস্তি হয়ে থাকে তাই। কিন্তু হিমলার তখন হিটলারের নাগালের বাইরে। তাকে ধরবার কোনো যো নেই। কাজেই আদেশ আর কার্যকরী হলো না।

* * *

ঊনত্রিশে এপ্রিল—রাত একটা।

হিটলারের জীবনের এক সন্ধিক্ষণ।

দূর থেকে ভেসে আসছে ভাগনারের মৃদু সঙ্গীত, আর ভেসে আসছে রুশ বাহিনীর কামানের গর্জন। ভাগনারের সঙ্গীত আর কামানের গর্জন দুটোই হিটলারের প্রিয়।

একটু বাদে হিটলার এক নাৎসী পাদ্রী কর্মচারীকে তলব করলেন। স্থির করেছেন তিনি আজ এভাকে ধর্মসাক্ষী করে বিয়ে করবেন। আজ জীবনের গোধূলি লগ্নে এভাকে বিয়ে করার কারণ আছে। তিনি জগৎবাসীকে জানাতে চান যে এভা ব্রাউন তাঁর স্ত্রী।

বিয়ে হয়ে গেলো নির্বিবাদে। কয়েকমুহূর্তের মধ্যে এভা ব্রাউনের পদবী বদলে হলো এভা হিটলার।

* * *

বিয়ের পর হিটলার কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। লিখতে শুরু করলেন তাঁর জবানবন্দী। জার্মানবাসীদের কাছে তাঁর কৈফিয়ৎ। আর সেই সঙ্গে করে গেলেন তাঁর উইল। বাঁটোয়ারা করলেন তাঁর সম্পত্তি। নিজস্ব সম্পত্তির মধ্যে কিছুই ছিলো না। মাত্র কিছু ছবি ছিলো। সেইগুলো তিনি দেশবাসীদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন।

* * *

'কলঙ্কের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে আজ আমি মৃত্যুকে বরণ করে নিচ্ছি।'

'দীর্ঘ বারো বছর ধরে আমি জার্মান জাতির সেবা করেছি। আজ জাতির জন্যেই আমি মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করে নিচ্ছি। আমার সমাধি যেন এই-খানেই দেয়া হয় এই আমার একান্ত অনুরোধ।'

লেখা যখন শেষ হলো তখন ভোর চারটে। সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ—কারু মুখে টুঁ শব্দ নেই।

হিটলার ক্লান্ত, বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে এবার একটু পাশের ঘরে গেলেন।

হিটলারের রাজনৈতিক উইলের উপসংহার লিখলেন গোয়েবলস। নিজের ভাগ্যকে তিনি হিটলারের ভাগ্যের সাথে জড়িয়েছেন। তাই তাঁর উইলের সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দিলেন নিজের জবানবন্দী।

'আজ থেকে শতাব্দী বাদে ইতিহাস আমাদের স্মরণ করবে। আমাদের কাহিনী পাবে ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান। জগৎবাসীর কাছে আমরা হবো কৌতূহলের বস্তু। সবাই জানতে চাইবে আমরা কী করে দিন কাটিয়েছি, কী করে সংগ্রাম করেছি, কী করে হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছি। ভবিষ্যৎ আমাদের কাপুরুষ বলবে না—এইটেই হবে আমাদের সব চাইতে গর্বের বিষয়।'

বিকেলে গোয়েবলস তাঁর এক বিশ্বস্ত অনুচর দিয়ে উইলটা শহরের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন।

এর একটু বাদেই খবর এলো হিটলারের পুরাতন বন্ধু মুসোলিনী জনতার কাছে প্রাণ হারিয়েছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে মুসোলিনীর রক্ষিতা ক্লারাও প্রাণ দিয়েছে।

* * *

মুসোলিনীর মৃত্যু-খবরে হিটলার এবার একটুও চাঞ্চল্য প্রকাশ করলেন না। এই রকম সংবাদ তিনি বহুদিন ধরেই আশা করছিলেন।

পরদিন সকালে গতানুগতিক ভাবে বড়ো বড়ো কর্মচারীদের বৈঠক হলো। শুরু হলো যুদ্ধের বিশদ বিবরণী। হিটলার নির্বিকার চিত্তে লড়াইয়ের ফিরিস্তি শুনলেন।

শহরের ভেতর তখন তীব্র লড়াই হচ্ছে। তিয়েরগার্তেন দখল করে রুশ বাহিনী পট্‌সডামার প্লাৎজে এসে পৌচেছে।

দুপুর দুটো অবধি কর্মচারীদের বৈঠক হলো।

এর পর শুরু হলো লাঞ্চ।

লাঞ্চের শেষে হিটলার গোয়েবলস ও বোরম্যানের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। এই তাঁর শেষ বিদায়।

একটু বাদে হিটলার ও এভা ব্রাউন তাঁদের ঘরের দরজা বন্ধ করলেন। তারপর শোনা গেল গুলীর শব্দ। কারু বুঝতে অসুবিধা হল না যে, হিটলার আত্মহত্যা করলেন।

সময় তখন বিকেল সাড়ে তিনটে, ত্রিশে এপ্রিল উনিশ-শ পঁয়তাল্লিশ।

* * *

এর পর শুরু হল সমাধির কাজ।

দুপুরবেলা হিটলারের ড্রাইভার কেমফকা দুশো লিটার পেট্রোল এনেছিলো। কেমফকা এবার পেট্রোল নিয়ে বাগানবাড়িতে গেলো। সমাধির

কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। নইলে শত্রু এসে পড়তে পারে যে কোন মুহূর্তে।

একটা কম্বলে হিটলারের দেহ জড়ানো হলো।

এভা ব্রাউনের দেহ বোরম্যান নিজের হাতে নিয়ে এলেন। তারপর একটা খোলা জায়গায় তাদের দেহ দুটোকে রেখে, পেট্রোল ঢেলে দেওয়া হলো। তারপর আগুন।

এক মুহূর্তে সব শেষ হয়ে গেলো।

দীর্ঘ বারো বছর ধরে যে মানুষ জগতকে ভয়ার্ত করে তুলেছিলো, যার কণ্ঠস্বর জগতের মাঝে এক সাড়া এনেছিলো, আজ তা বিলীন হয়ে গেলো।

* * *

এর পরের কাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত।

বোরম্যান গিয়ে এডমিরাল ডোয়েনিৎজকে জানালেন যে হিটলার তাঁকে রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী করে গেছেন। অবশ্যি হিটলার যে আত্মহত্যা করেছেন এ খবরটা চেপে যাওয়া হলো।

রুশ বাহিনীর সাথে এবার সন্ধির শেষ চেষ্টা করলেন গোয়েবলস ও বোরম্যান। কিন্তু সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করলে রুশ বাহিনী। তাদের এক জবাব—চাই বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ।

বেগতিক দেখে বোরম্যান এবার ডোয়েনিৎজকে জানালেন যে হিটলার আত্মহত্যা করেছেন।

* * *

মে মাসের পয়লা তারিখ। জার্মান রেডিওতে নিউজের পরে ভাগনারের সুমধুর সঙ্গীত বেজে উঠলো। হিটলারের প্রিয় সঙ্গীত।

একটু বাদেই গম্ভীর কণ্ঠে বিশ্ববাসীকে জানান হলো হিটলারের মৃত্যু খবর।

এরপর আবার ব্রকনারের সেভেন্থ সিম্ফনি বেজে উঠলো।

ইতিমধ্যে হিটলারের শিবিরে এক আলোড়ন শুরু হয়েছে। রুশবাহিনী

হিটলারের শিবিরের নিকটে এগিয়ে আসছে দ্রুতগতিতে। বিপদের হাত থেকে এড়াবার জন্যে সবাই পালাবার চেষ্টা করছেন।

সবার অজ্ঞাতসারে বোরম্যান পালিয়ে গেলেন। আজ অবধি তিনি জীবিত না মৃত এ-খবর কেউ জানে না।

গোয়েবলস কিন্তু ধীর, স্থির।

পালাবার কোন চেষ্টাই তিনি করলেন না। প্রথমে তিনি নিজের হাতে তাঁর পাঁচ ছেলেকে বিষ খেতে দিলেন। তারপর নিজের স্ত্রীকে গুলী করলেন। সব শেষে নিজে করলেন আত্মহত্যা।

এমনি করে শেষ হলো প্রচার বিশারদ ডাঃ গোয়েবলসের জীবন। এমনি করে ভেঙ্গে পড়লো জার্মান সাম্রাজ্য।

তাসের ঘরের মত ধ্বসে পড়ল নাৎসী-দল, যার হুঙ্কারে একদিন সমস্ত পৃথিবী তটস্থ হয়ে উঠেছিলো।

* * *

দূর থেকে ভেসে এলো রুশবাহিনীর পদধ্বনি। এগিয়ে আসছে তারা দ্রুতগতিতে। সূর্যের ম্লান রশ্মি এসে পড়েছে জার্মান দেশের বুকে।

একটু বাদেই ঘনিয়ে আসবে সন্ধ্যা—শুরু হবে অন্ধকারের রাজ্য।

* * *

উনিশ

তিন নিয়ে নাটক—ভূমিকা, কাহিনী ও উপসংহার!

ভবঘুরের মতো প্যারীতে এসে লড়াইতে ধরা দিয়েছিলাম সেইটেই ছিলো আমার জীবন নাটকের ভূমিকা।

তারপরে জীবন কাটলো কারাগারে, প্যারীতে, বার্লিনে, হিলভারসামে। সেই হলো আমার জীবন নাটকের কাহিনী।

এবার বলা যাক উপসংহারের কথা।

অর্থাৎ নাটকের শেষ দৃশ্য—যবনিকা পতন।

*　　　*　　　*

জার্মানীর বিপদ চারদিক থেকে তখন ঘনিয়ে আসছে।

সে বিপদ দেখে আমরাও চিন্তিত হলাম। আমাদের সমস্যা—হোয়াট টু ডু, এ্যাণ্ড হোয়াট নট টু ডু। সবারই অভিমত, এই বিপদে হল্যাণ্ড দেশে থাকা মূর্খমি। তাই ভাবনা শুরু হলো কী করে এই বিপদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

একদিন আর্জি পেশ করলাম জার্মান কর্তৃপক্ষের কাছে। বললাম, বার্লিনে ফিরে যাবো।

আমাদের অনুরোধ শুনে জার্মান কর্তৃপক্ষ তো হতভম্ব। তাঁদের ভাবখানা এই রকম, যেন আমরা পাগল হয়ে গেছি। এই সঙ্কটের সময় সবাই বার্লিন থেকে বেরুতে চাইছে। আর আমরা কিনা আগুনে ঝাঁপ দিতে চাইছি। আশ্চর্য!

বেশ খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করার পর জার্মান কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রস্তাবে রাজী হলেন। বললেন, বেশ বার্লিনে চলো।

সমস্ত বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করে আমরা ফিরে এলাম। বোমা, কামানের

গোলা কিছুই গ্রাহ্য করি নি। মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেলো শত্রুর বিমান বাহিনী কিন্তু আমাদের ভয় ডর নেই।

আমাদের প্রচার কাজে কিন্তু তখনও ভাঁটা পড়ে নি।

আজাদ হিন্দ রেডিও পুরোদমে কাজ করছে।

জার্মান টেকনিশিয়ানদের সহায়তায় আবার আমাদের বেতার ঘাঁটি বসানো হলো। হেল্‌ম্‌স্টাডের কাছে আমাদের ছাউনী পড়লো।

* * *

কয়েকটা দিন আমি বাদেন-বাদেনে কাটালাম। আমার চারদিকে প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্য। ব্ল্যাক ফরেস্টের পাহাড়ে ঢাকা।

যুদ্ধের চাঞ্চল্য এখানে সাড়া জাগায় নি। তাই বেশ কয়েকটা দিন নিশ্চিন্ত মনে রইলাম। ক্বচিৎ কদাচিত শত্রুর বিমান বাহিনী এসে আমাদের শান্তিতে বিঘ্ন ঘটায়।

কয়েক দিন বাদে আবার হেল্‌ম্‌স্টাডে ফিরে এলাম। আমার বন্ধুরা ইতিমধ্যে ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন। ভবিষ্যৎ অন্ধকার, কী হবে জানি নে। লড়াইয়ের ফলাফল বিশেষ নৈরাশ্যজনক।

বছর ঘুরে এলো শীত, এলো ক্রীসমাস। ভগবান যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন।

এ আনন্দের মাঝে আমরা সবাই যেন নিস্তেজ, ক্লান্ত।

সবারই এক চিন্তা ধ্বংসের হাত থেকে কী করে রক্ষা পাওয়া যায়!

* * *

তারপর এলো ছাব্বিশে জানুয়ারী—আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন।

সবাই জড়ো হলাম নিজেদের ভাগ্যের হিসেব-নিকেশ করতে।

ইতিমধ্যে অবস্থার হের ফেরে আমাদের বন্ধুত্ব অনেকটা শিথিল হয়েছে। একে অন্যকে দেখি সন্দেহের চোখে, করি অবিশ্বাস। মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। আমাদের দেখলেই মনে হয় আমরা যেন ভাবনাগ্রস্ত বৃদ্ধের দল।

এমনি দুর্দিনে একদিন পেলাম এক দুঃসংবাদ। শুনলাম অম্বিকা মারা গেছে।

*   *   *

চোখের সামনে আমি যেন অম্বিকাকে দেখতে পাই।

সঙ্গীত প্রেয়সী অম্বিকা। কতো দিন, কতো সন্ধ্যায় তার সঙ্গে বসে মোৎজার, লিষ্ট, দেবুসী-র সঙ্গীত শুনেছি। একটি সন্ধ্যা আমার:আজও মনে আছে।

সুভাষের ঘরে একটি ছোট পিয়ানো ছিলো। কেউ ব্যবহার করতো না। অম্বিকা সুভাষকে গিয়ে বললে : আপনার আপত্তি না থাকলে ঐ যন্ত্রটা আমি ব্যবহার করতে চাই।

অম্বিকার সঙ্গীতের প্রতি ঝোঁক সুভাষ জানতো। সানন্দে তাই সে অনুমতি দিলে। এর পর থেকে প্রতি সন্ধ্যায় অম্বিকা যেতো সুভাষের বাড়ি।

এমনি এক সন্ধ্যায় আমরা সবাই অম্বিকাকে ঘিরে তার বাজনা শুনছিলাম। পিয়ানোতে অম্বিকা কার সুর তুলেছিলো মনে নেই, হয়তো শোঁপা কিংবা লিষ্টের হবে।

বাজনা শুনতে শুনতে আমরা আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। সময়ের খেয়াল ছিলো না।

সঙ্গীত শেষে পেছন থেকে কে যেন হাততালি দিয়ে উঠলো। তাকিয়ে দেখি, সুভাষ।

সুভাষ বলল : খাসা তোমার হাত অম্বিকা। আমি সঙ্গীতের এক্সপার্ট নই, তবু একজন নীরব সমঝদার। আজ তোমার বাজনা আমার ভারী ভালো লেগেছে।

সুভাষের কথা শুনে অম্বিকা যেন একটু লজ্জা পায়।

*   *   *

ড্রেসডেনের বোমা বর্ষণে অম্বিকা মারা গেলো। তার মৃত্যুটা আকস্মিক এবং আমাদের সবাইকে একটু চিন্তিত করে তুললো।

অম্বিকা ইউরোপে এসেছিলো বিখ্যাত নর্তকী মেনকার সাথে। এখানে

এসে তার ইউরোপকে ভালো লাগে। তাই এখানে থেকে যায়। কিছুদিন বাদে কোয়েনিসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সঙ্গীতের ডক্টরেট নেয়।

*　　　　*　　　　*

'মানুষ বর্বর তাই সে যুদ্ধ করে' বেটোফেন নাপোলিওকে উদ্দেশ্য করে একদিন বলেছিলেন।

নাপোলিও ভিয়েনা আক্রমণ করেছিলেন আর বেটোফেন রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত ফিফথ কনচার্টো। কে একজন ব্যঙ্গ করে এই সঙ্গীতের নামকরণ করলে এম্পারার। বেটোফেন রেগে গেলেন—কারণ তিনি সঙ্গীতের পূজারী, লড়াইয়ের নয়।

আজকের লড়াই তেমনি অম্বিকাকে ব্যথিত করেছিলো। বেটোফেনের শিষ্য তাই অম্বিকা। তাই সে লড়াই যোগ দিতে চায় নি কিন্তু সুভাষের আহ্বানে আজাদ হিন্দ সংঘে যোগ দিলে।

কিন্তু বেশীদিন নয়। অস্ত্রের হানাহানি অম্বিকা সহ্য করতে পারলে না। আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করে ড্রেসডেনে চলে গেলো।

সেইখানেই তার মৃত্যু ঘটল।

*　　　　*　　　　*

কয়েকদিন বাদে আমিও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেলাম।

হেল্‌ম্‌স্টেড থেকে বার্লিন যাচ্ছিলাম। ট্রেন এসে ম্যাগদেবুর্গ বলে একটা স্টেশনে থামলো। হাত পা একটু ছড়িয়ে নেবার জন্যে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পায়চারী করতে লাগলাম। এমনি সময় সাইরেনের করুণ আওয়াজ শুনতে পেলাম। শঙ্কিত হয়ে ভাবছি কোথায় আশ্রয় নিই—এমনি সময় কে যেন বললে পার্সেল গুদাম ঘরে জায়গা আছে। দৌড়ে গিয়ে সেইখানে আশ্রয় নিলাম। একটু বাদে বোমার গর্জনে সমস্ত জায়গাটা কাঁপতে লাগলো।

বোমার চোট যাতে না লাগে, তার জন্যে আমি আর এক জার্মান গুদামে ঢুকবার দরজাটা বন্ধ করে রেখেছিলাম। হঠাৎ এক বোমা এসে দরজার কাছে পড়লো। ব্যস্ আর কথা নেই। দড়াম করে দরজাটা উড়ে

গেলো। বোমার আগুনের খানিকটা ঝলক এসে আমার মুখে লাগল। আমার মনে হলো সমস্ত মুখটা যেন পুড়ে গেছে।

একটু বাদে আবার সাইরেনের ধ্বনি নিরাপদের সঙ্কেত জানিয়ে গেলো। আমার সঙ্গী জার্মান ছেলেটিকে নিয়ে আমি শহরের পানে রওনা হলাম।

শহরকে দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস হলো না। এ যে অভাবনীয় দৃশ্য। যে দিকে চোখ যায় শুধু দেখতে পাই ভাঙা বাড়ি। রাস্তার চার পাশে ভাঙা টেবিল চেয়ার। কিছু জলছে—কিছু ছড়িয়ে আছে।

একটু বাদেই এক দমকা বাতাস শুরু হলো। আগুন এবার তাতিয়ে উঠলো। সমস্ত শহর দেখলে মনে হয় যেন নরক কুণ্ডের আগুন জ্বলছে।

প্রায় মাইল খানেক ভবঘুরের মতো ঘুরলাম। কিছুক্ষণ বাদে এক বৃদ্ধা এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কোথায় যাই, কী করি জানি নে।

বেশ খানিকক্ষণ হাঁটার পর যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তখন এক জায়গায় আশ্রয় মিললো। একটি জার্মান ছেলে আমাদের সবাইকে উইলহেল্‌ম্‌স্টাডে তার বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে এলো। সেইখানে এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা আমাদের দেখাশোনা করলেন। তাঁর সেদিনকার আদর যত্ন ভোলবার নয়।

* * *

বার্লিনের বাইরে।

প্রতিদিনই বিভিন্ন শহরগুলোয় ইংরেজের বিমান বাহিনী এসে হানা দিচ্ছে। এক এক রাত্রে এই সব শহর প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

এই সব শহর থেকে বার্লিনে ভেসে আসছে শরণার্থীর দল। তাদের থাকবার জায়গা নেই—নেই খাবার স্থান। অধিকাংশই স্টেশনে এয়ার রেড শেল্টারে এসে ঠাঁই নিচ্ছে। কেউ বা রাস্তার পাশে তাঁবু খাটিয়ে জায়গা করে নিয়েছে।

ছোট খাটো সব শহরেই বিশৃঙ্খলা। ট্রাম নেই, গাড়ি নেই, বিজলী বাতি জ্বলছে না।

আমাদের আজাদ হিন্দ সংঘেরও সমস্যা বাড়তে লাগল। শত্রুর সামরিক

বাহিনী এসে পড়ার আগে আমরা নিরাপদ স্থানে যাবার জন্যে ব্যগ্র হলাম। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও যাবার উপায় নেই। কারণ শহরের একস্থান থেকে অপর স্থানে যেতে হলে সামরিক কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র চাই। এ ছাড়া ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাও অনিশ্চিত। দলের নেতা নাম্বিয়ার। তাঁর সন্ধান জানি নে। তাঁর মারফৎ যে জার্মান কর্তৃপক্ষকে অন্যত্র যাবার অনুরোধ করবো সে উপায়ও নেই।

তাই বেশ দুশ্চিন্তার ভেতর দিয়ে আমাদের সময় কাটতে লাগল।

*   *   *

একদিন শুরু হলো আমার অজানার যাত্রা।

উৎকণ্ঠায় চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে ভাবলাম আর বার্লিনে থাকা নয়। কিছু দিনের জন্যে বাদেন-বাদেনে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া যাক।

হেল্‌ম্‌স্টাডে এসে ট্রেনে চাপলাম। কিন্তু ট্রেন কোথায় যাবে জানি নে। আজকাল ট্রেন চলাচলের কোন স্থিরতা নেই। তবু সমস্ত কম্পার্টমেণ্টই জনতায় ভর্তি। মাথা গলাবার একটু জায়গা নেই।

আমার বন্ধু হরবনস্‌ লাল, মুকুন্দ ভিয়াস এসেছিলো আমাকে ট্রেনে উঠিয়ে দিতে। আজ তাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে চোখে জল এলো। কেন জানি নে।

একটু বাদে ট্রেন চলতে শুরু করলে। এই অনিশ্চয়তার ভেতর কখনও যে ট্রেন চলবে, এ কল্পনা করি নি। তাই গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু আনন্দ হল। বিদায়-দুঃখের ক্ষতিপূরণ পেলাম গাড়ি চলার মৃদুমন্দ ঝাঁকুনিতে।

শোয়েনিঙ্গেনে এসে গাড়ি থামল।

শুনতে পেলাম এই পর্যন্তই গাড়ি যাবে। এর পরে নয়। ঘণ্টা দুয়েক বাদে 'হালে' যাবার একটা ট্রেন পেলাম। এমনি করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা, এক গাড়ি বদল করে অন্য গাড়িতে বসে ক্লান্ত হয়ে উঠলাম। কিন্তু বাদেন-বাদেন তখনও বেশ দূরে। ঘুরতে ঘুরতে আইসেনাকে এলাম। জায়গাটা সঙ্গীতশিল্পী বাখের জন্মস্থান বলে প্রসিদ্ধ। বহুদিন ধরেই এখানে আসার সঙ্কল্প ছিল কিন্তু নানা বাধা বিপত্তিতে আর আসা হয়ে ওঠে নি।

আইসেনাক থেকে মেনিঙ্গেনে, সেখান থেকে সোইয়ানফুট, তারপর উইজুর্ক এসে পৌছলাম। উইজুর্ক ব্যাভেরিয়াতে। এখানে এসে দেখতে পেলাম প্রকৃতির নতুন রূপ। এখানকার মানুষরা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। বাচাল, মেলামেশায় পটু। সরকারকে সমালোচনা করতে একটু দ্বিধা নেই। বিনা সঙ্কোচে তারা নাৎসী সরকারকে গালিগালাজ করছে।

বোমার চোটটা এ অঞ্চলে বেশ লেগেছে। শহর দেখলেই বোঝা যায়। চারদিকে ভগ্নস্তূপ, বিশৃঙ্খলা।

* * *

ঘোরাফেরা করে আমি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তাই একটা হোটেলে গিয়ে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিলাম। হোটেল ভর্তি। চারদিক থেকে ভেসে আসছে শরণার্থীর দল। খালি ঘর পাওয়া অসম্ভব বললেই চলে। তবু আমার বরাত ছিলো ভালো। একটা ঘর পেলাম।

হোটেলে সন্ধ্যা নাগাদ আরাম করা গেলো। তারপর আবার শুরু হলো যাত্রা। স্টেশনে এসে দেখি আহত সৈন্যতে প্ল্যাটফর্ম ভর্তি। তাদের কাতর গোঙানি, চাপা কণ্ঠস্বর মিলিয়ে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

প্ল্যাটফর্মে দোমুইলে যাবার জন্যে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। তাকিয়ে দেখি গার্ড সাহেব নীল নিশান দেখিয়েছেন। আর দেরী নয়। তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসলাম। মাঝরাত্রে হেইলব্রনে এসে পৌছলাম। সেখান থেকে ট্রেনে করে স্টুটগার্টে এলাম। তখন ভোর প্রায় চারটা। পাখির কলরবে শহর মুখরিত।

স্টুটগার্টে এসে দেখি এক বিভ্রাট। বাদেন-বাদেনে যাবার কোন গাড়ি নেই। ভাবলাম দিনটা তাহলে এই শহরেয়ই কাটানো যাক। এখানে আমার পরিচিত এক পরিবার থাকেন। স্টেশনে মালপত্র রেখে তাদের সন্ধানে বেরুলাম। কিন্তু শিগ্‌গিরই আমাকে নিরাশ হতে হলো। যুদ্ধের তাড়ায় আমার বন্ধুরা শহর থেকে চলে গেছেন। বাধ্য হয়ে ট্রেনে করে ফ্রয়ডেন্‌স্টাডে এলাম।

*　　　　*　　　　*

প্রবাদ আছে অভাগা যেখানে যায়, সাগর শুকায়ে যায়।

আশ্রয়ের সন্ধানে আজ ছ'দিন ধরে একটানা চলছি। এক শহর থেকে অন্য শহর। বিশ্রাম নেই, আহার নেই, ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু সব জায়গাতেই একই উত্তর—ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার এই সংগ্রাম দেখে নিজেরই হাসি পায়।

এমনি দুরবস্থার মধ্যে কে যেন বললে: জানো গার্নেসবাকে যাবার একটা ট্রেন আছে। কথাটা শুনে আর দেরী করলাম না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গার্নেসবাকে এসে পৌঁছলাম। সেখান থেকে বাদেন-বাদেন সন্নিকটে। দুটো শহরের মাঝখানে একটা ছোট পর্বত। যান-বাহনের অভাব দেখে আমি পায়ে বাদেন-বাদেনের পানে রওনা দিলাম।

*　　　　*　　　　*

দীর্ঘ আটদিন ভ্রমণের পর বাদেন-বাদেনের মুখ দেখতে পেলাম। মনটা আনন্দে নেচে উঠল। ভাবলাম, যাক, এ যাত্রা তবু মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেলাম।

হোটেলে এসে যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। প্রবল জ্বরে আমি তখন প্রলাপ বকছি।

*　　　　*　　　　*

তারপরের ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে নেই। শুধু মনে আছে আমার শুশ্রূষাকারীকে, যার সেবায় সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছিলাম। বাইরের জগতে কী ঘটেছে জানি নে। রাস্তা থেকে কখনও কখনও ভেসে আসে সৈন্যবাহিনীর পদধ্বনি। কখনও কখনও পাশের ঘর থেকে ভয়ার্ত যাত্রীর সংলাপ শুনতে পাই। 'এস ইসত আনমোগলিশ দাস দি ইংগল্যাণ্ডার ইয়ার সাইন সোলেন' (অসম্ভব, ইংরেজ এখানে কখনও আসতে পারবে না)। কখনও কখনও শুনি আশার বাণী—জয়লাভের আর দেরী নেই। যে দেশের নেতা হিটলার তার ভাবনা ভয় কিসের!

*　　　　*　　　　*

সেদিনকার বিক্ষিপ্ত সংলাপ আমি কখনও ভুলি নি। কারণ বার্লিন থেকে বাদেন-বাদেনে আসার পথে যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখেছি তা আমার মনের মধ্যে গেঁথে ছিল। কখনও জয়লাভের স্বপ্ন দেখি নি, ভাবতে পারি নি যে, জার্মান জাতির মুখে শুনতে পাবো, 'ডয়েচল্যাণ্ড উইবার আলেস'।

*　　　　*　　　　*

রোগ থেকে ভুগে উঠে দেখি আর এক বিভ্রাট। জ্বরের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছি বেঁচে ওঠার। অসুখ থেকে সেরে উঠে চোখের সামনে দেখতে পেলাম মৃত্যুর ছবি। সবার মুখে এক কথা। শত্রু আগত ঐ।

সামরিক কর্তৃপক্ষ এসে বলে গেলেন বিদেশীদের এখানে থাকা নিষেধ। এটা লড়াই ক্ষেত্র।

এমনি দুর্যোগের সময় ফ্রেডার সাথে দেখা।

ফ্রেডা থাকতো ফ্রাঙ্কফুর্টে। ওর বাবা ছিলেন সৈন্যবাহিনীর এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী, দু ভাই আছে সৈন্যবাহিনীতে। ফ্রেডা কাজ করতো প্রথমে পররাষ্ট্র দপ্তরে। তারপর এলো রেডক্রশে। সুভাষ যখন বার্লিনে এল তখন পররাষ্ট্র দপ্তর ফ্রেডাকে পাঠালো সুভাষের কাজে সাহায্যের জন্যে। সেই থেকে ফ্রেডাও আজাদ হিন্দ সংঘের কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।

সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশ শুনে আমি যখন ভবিষ্যৎ নিয়ে গবেষণা করছি, তখন ফ্রেডা এসে বললে : মুখুজ্যে চলো যাই বার্লিনে।

ফ্রেডা যতো সহজে বার্লিনে যাবার প্রস্তাব করতে পারলে, অতো সহজে আমরা বার্লিনে যেতে পারলাম না। কারণ যাবার ট্রেন নেই, না আছে অন্য কোন যানবাহন। বাধ্য হয়ে আবার গার্নেসবাকে হেঁটে এলাম। সেখানে এসে ধরলাম স্টুটগার্টের ট্রেন। সেখান থেকে এলাম হেবুর্গে।

*　　　　*　　　　*

হেবুর্গে আজাদ হিন্দ সংঘের একটি ছোট দপ্তর ছিল।

সেখানে এসে দেখি সংঘের কর্মীরা ভয়ানক উত্তেজিত। তাদেরও আমাদের মত ভবিষ্যৎ নিয়ে বিরাট সমস্যা। ফরাসী সৈন্য বাহিনী এ অঞ্চলের পানে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। বাজারে গুজব যে এবার যুদ্ধক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ সংঘের কর্মীদের পাঠান হবে। তাই সহকর্মীরা একটু বিচলিত হয়ে উঠেছেন। তারা ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত নন। কারণ নেতাজী তাদের বলেছেন ভারতের শত্রু ইংরেজ। ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার আদেশ নেতাজী কখনই দেন নি। তাহলে কী করবো—আমায় দেখে সহকর্মীরা একবাক্যে প্রশ্ন করলেন।

* * *

হুকুম দেবার অধিকার আমার নেই।

তাদের বুঝিয়ে বলি যে, আদেশ দিতে পারেন একমাত্র নাম্বিয়ার।

এখানকার আজাদ হিন্দ সংঘের নেতা ডাঃ ইসাক। ডাঃ ইসাক পাটনার একজন স্বনামখ্যাত ভেটিরনারী সার্জন।

তিনি আমায় বললেন: মুখুজ্যে সাহেব, আমাদের কর্মীরা ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। সময় থাকতে এদের শান্ত না করলে পরে বিপদ দেখা দিতে পারে।

ডাঃ ইসাকের অনুরোধ সত্যিই আমায় দ্বিধায় ফেললে। আমার আদেশ, হুকুম দেবার অধিকার নেই কারণ সংঘের হর্তা-কর্তা হলেন নাম্বিয়ার। আজকে এখানে তাঁরই প্রয়োজন বেশী। কিন্তু কোথায় তিনি? কারু কারু ধারণা তিনি বার্লিনে, কেউ বলে তিনি অন্যত্র। কিন্তু এই সঙ্কট মুহূর্তে ডাঃ ইসাকের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না।

আমি বক্তা নই, কথা বলে লোককে ঘুম পাড়ানোর অভ্যেস আমার নেই। কিন্তু তবু সেদিন নেতাজীর নাম নিয়ে কর্মীদের কাছে বলতে শুরু করলাম। বুঝিয়ে বললাম তাদের অবস্থার গুরুত্ব। আজকের দিনে বিচলিত হলে পরে অবস্থার গুরুত্ব বাড়বে বৈ কমবে নয়।

কয়েকজন আমার বক্তৃতা শুনে উত্তেজিত হয়ে পড়লে। প্রশ্নবাণে আমাকে জর্জরিত করলে। বুঝতে পারলাম যে সভা ক্রমেই আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে আবার নেতাজীর নাম করে বললাম যে বিপদে কী করে চলতে হয় তার পথ নেতাজী আমাদের দেখিয়েছেন।

নেতাজীর নাম করার সঙ্গে সঙ্গে এক অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা গেল। উত্তেজিত জনতা হল শান্ত। সবাই প্রতিশ্রুতি দিলে যে তারা নেতাজীর আদেশ, মৃত্যু অবধি পালন করবে।

হেবুর্গে আর কয়েকটা দিন কাটালাম। সেখান থেকে বার্লিনে টেলিফোন করার চেষ্টা করি কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। অপর প্রান্ত থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই। সবাই বললে জার্মানীর চারদিকে বিশৃঙ্খলার তাণ্ডব নৃত্য চলছে। এ অবস্থায় টেলিফোন করে লাভ নেই।

কর্মীরা এসে বললে : মুখুজ্যে সাহেব টেলিফোন করে ফল হবে না বরং স্বশরীরে বার্লিনে যান। দেখুন যদি কিছু হয়।

বন্ধুরা বললে বটে কিন্তু আমার ভাবনা—কী করে যাই। ট্রেন পাওয়া প্রায় অনিশ্চিত বললেই চলে।

সংঘের এক কর্মী নারায়ণ মূর্তি বললে, আমি যাবো আপনার সঙ্গে। চলুন সিগমারীঙ্গেনে সেখান থেকে যাবো নুরেমবুর্গ। বার্লিনে এখনও ট্রেন চলাচল করছে।

* *

বহু আশা করে সিগমারীঙ্গেনে এলাম। ভাবলাম একবার নুরেমবুর্গ যেতে পারলে পর বালিনে যাবার জন্যে আর চিন্তা ভাবনা করতে হবে না। কিন্তু এখানে এসে আমাদের চক্ষু চড়ক গাছ। সিগমারীঙ্গেন শরণার্থীদের সরাইখানা। এ শহরে এসে জড়ো হয়েছে বিভিন্ন জাতি। ফরাসী নাৎসী সরকারও এসে উপস্থিত হয়েছেন আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এসেছেন মার্শাল

পৌঁছ্যা। বার্লিন থেকে হেলমষ্টাডে যাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। বুঝতে দেরী হল না যে ফাঁদে পা দিয়েছি।

*　　　*　　　*

চিন্তা করে যদি সমস্যার সমাধান করা যেতো তাহ'লে সংসারে সবাই দার্শনিক হতেন। এই সঙ্কট মুহূর্তে আমি তাই দর্শন ছেড়ে বাস্তববাদী হবার চেষ্টা করলাম। বিপদ থেকে বেরুতে হবে, এই আমার পণ। কিন্তু কী করে—সেই আমার সমস্যা!

ঘটনাচক্রে কিতাহারার সঙ্গে দেখা হল। কিতাহারা ফরাসী দেশে জাপানী দূতাবাসের এটাসে। ভিসী সরকারের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও এ অঞ্চলে এসেছিলেন। তার সঙ্গে আমার প্যারীতে থাকাকালীন মুখ চেনাচিনি হয়েছিল।

কিতাহারা আমাদের দুর্গতি দেখে দুঃখ প্রকাশ করলে। বললে : মুখুজ্যে, লড়াইর শেষ হয়েছে। পরাজয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। এখন আর এক মুহূর্ত জার্মানীতে থাকা পাগলামী। আমরা দূতাবাসের সবাই সুইজারল্যাণ্ডে যাচ্ছি। চলে এসোনা আমাদের সঙ্গে।

কিতাহারার কথা শুনে আমি হতভম্ব। লোকটা বলে কী? মনে মনে জানতুম যে লড়াই শেষ হয়েছে কিন্তু কখনও তা বাইরে প্রকাশ করিনি। কিন্তু আজ কিতাহারা, যখন আমার মনের কথা প্রকাশ করলে তখন বিস্ময় প্রকাশ না করে পারিনি।

লড়াইতে পরাজয় হয়েছে শুনে মৃতি কিন্তু ভেঙ্গে পড়লে না। বললে : মুখুজ্যে সাহেব, কিতাহারা ঠিকই বলেছে। লড়াই শেষ হয়েছে। চলুন, আমরাও সুইজারল্যাণ্ডে পাড়ি দিই।

যতো তাড়াতাড়ি মৃতি সুইজারল্যাণ্ডে যাবার প্রস্তাব করলে, আমরা কিন্তু অত শিগ্‌গির যাবার আয়োজন করতে পারলাম না। ওদেশে যেতে হলে চাই ছাড়পত্র অর্থাৎ ভিসা। সুইস সরকারের বিনানুমতিতে ওদেশে পা দেওয়া

অসম্ভব। অথচ এই হট্টগোলে সুইস সরকারের অনুমতি পাওয়া নিতান্তই দুরূহ কাজ।

*　　　　*　　　　*

জীবনের বহু অভিজ্ঞতা ছিল। যেমনি আইন অমান্য করা—পুলিশের তাড়া খাওয়া কিন্তু সব কিছুই যেন রপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ চোরের মত সীমান্ত পার হতে কেমন যেন সংকোচ হল। আমার দ্বিধা দেখে মূর্তি তাড়া দেয়। বলে : মুখুজ্যে সাহেব, মান, লজ্জা, ভয়, তিন থাকতে নয়। আর ভাবনা করা মিছে। দেরী করলে বিপদে পড়তে হবে।

ভেবে দেখলাম ভুল বলেনি মূর্তি। মিত্রশক্তির বাহিনী বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে আসছে এই অঞ্চলের পানে। আজ জার্মানদের সাথে আমরাও তাদের দুষমন হয়েছি। ইংরেজদের বিরুদ্ধে গালি-গালাজ করেছি। অতএব আমাদের রেহাই পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

সামনেই একটা লরী দাঁড়িয়েছিল। প্যারী থেকে জার্মান দূতাবাসের মালপত্রে বোঝাই। শুধু তাই নয়, পরে কিংবদন্তী শুনেছিলাম প্যারীর কিছু বিখ্যাত ছবি এই লরীতে ছিলো। মূর্তি বললে : চলুন আর দেরী নয়। এটাতে চড়ে বসি।

যা বলা তাই কাজ। লরী করে কিছুটা পথ এলাম। গ্রামের নাম ভানগেন। কিতাহারা পরামর্শ দিয়েছিল অষ্ট্রিয়া যেতে। সেখান থেকে সুইজারল্যাণ্ডে পালিয়ে আসা সহজ কাজ। কিন্তু ভানগেনে এসে দেখি এগোবার পথ নেই। ট্রেণ বন্ধ। সুইজারল্যাণ্ডে যেতে হলে লিনডাউতে আসতে হবে। বেগতিক দেখে হাঁটা দিলাম। মূর্তির মাথায় বাক্স-পেটরা, আমার হাতে সুটকেশ। আমাদের জীর্ণ পোষাক, তামাটে রং, মাথায় বাক্স সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

হেরগেজ বলে একটা অঞ্চলে এসে শুনি এখান থেকে লিনডাউর ট্রেণ পাওয়া যাবে। ব্যস, আর দেরী করলাম না। সোজা স্টেশনের পানে রওনা দিলাম। স্টেশনে এসে দেখি গাড়ী তৈরী। ট্রেণে চেপে সোজা চলে এলাম লিনডাউতে।

*   *   *

'লিনডাউর অপর প্রান্তে সুইস শহর। মধ্যিখানে শুধু একটা লেকের ব্যবধান। দোকানপসারী, ক্রেতার কলরবে সুইস শহর মুখরিত। জনতার মুখে নেই চিন্তা, নেই উদ্বিগ্ন। খুশিমনে তারা চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যার পর শহর আলোয় ঝলমল করে ওঠে। এয়ার রেডের সঙ্কেত, ব্ল্যাকআউটের ঝামেলা নেই।

লেকের এপারে বসে আমরা দীর্ঘশ্বাস ফেলি, ভাবি অপর প্রান্তে কতো সুখ, কতো সুবিধে।

লিনডাউ থেকে এলাম ব্রেগানজে। এখানে বরাত ছিল ভাল। থাকবার জন্যে একটা হোটেলে স্থান মিলে গেল। তার অবশ্যি একটা গৌণ কারণ ছিলো। মূর্ত্তির হাভভাব চালচলন সবই আমিরী। কাজেই মহারাজা পরিচয় দিয়ে দিব্যি সুখ-সুবিধে আদায় করতে লাগল।

ব্রেগানজে এসে থাকবার স্থান পেলাম বটে কিন্তু সীমান্ত পার হবার কোন সুবিধে হল না।

ট্রেণে চড়ে সীমান্ত পার হবার কোন সম্ভাবনা নেই। জার্মান কর্তৃপক্ষের নিষেধ। এ ছাড়া সীমান্ত পার হবার জন্যে জার্মান কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র চাই।

ছাড়পত্রের জন্যে জার্মান কর্তৃপক্ষের দরবারে ধর্ণা দিলাম। গ্রামের বুর্গোমাস্টারকে গিয়ে বললাম 'সুইজারল্যাণ্ডে' যাবার অনুমতি পত্র দাও। আমাদের দাবী শুনে লোকটা হতভম্ব। সুইজারল্যাণ্ডে যাবো, কী জন্যে? এ লড়াইতে জার্মানীর জয় নিশ্চিন্ত। হিটলারের পরাজয় অসম্ভব।

কথাবার্তায় বুঝতে অসুবিধে হল না যে লোকটা নাৎসী দলের একজন চাঁই। এখনও এ ববিশ্বাস যে এ লড়াইতে তাদের জয় হবে।

বুর্গোমাস্টারের দপ্তর থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম। গ্রামের দু-তিনজন চাঁইদের সাথে আলাপ করে জানতে পারলাম যে নিকটেই পররাষ্ট্র দপ্তরের একটা বিভাগ আছে। সেখানে গিয়ে ধর্ণা দিলে একটা বন্দোবস্ত হলেও বা হতে পারে।

*　　　　*　　　　*

নৌকা করে কনস্টান্স গ্রামে এলাম।

লড়াইতে এ অঞ্চলের বেশ ক্ষতি হয়েছে। যাতায়াতের জন্যে কোন যান বাহন নেই। সারাটা রাত হাঁটতে হল। শহরের চারদিক নীরব নিস্তব্ধ। এতো শান্ত শহর আগে কখনও দেখিনি। সেই নীরবতার ভেতর প্রকৃতির রূপ দেখে মুগ্ধ হলাম। আকাশে তারা জ্বলছে। মেঘের সাথে লুকোচুরি খেলছে চাঁদ।

হাঁটতে হাঁটতে—আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি। মূর্তি বলে: মুখুজ্যে সাহেব, চলুন একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক।

মূর্তির প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলাম।

লড়াই'র হানাহানির পর আজ এই অঞ্চলের শান্ত রূপ আমাকে মুগ্ধ করেছে।

লেকের সামনেই একটা বেঞ্চি। সেইখানে আমরা সবাই গিয়ে বসি। অপর প্রান্তে সুইস শহর। সেই শহরের আলো এসে জলের উপর পড়েছে।

অন্ধকারের মধ্যে আমরা চুপ করে বসেছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম একটা অস্পষ্ট মূর্তি আমাদের পানে এগিয়ে আসছে। কাছে এলে দেখতে পেলাম লোকটা একজন জার্মান সৈনিক। উচ্চপদস্থ কর্মচারীই হবে।

লোকটি কারু সাথে কোন কথা বললে না। চুপ করে আমাদের বেঞ্চির একপাশে বসলো। তারপর সব চুপ চাপ। শুধু ভেসে আসতে লাগল জলের কলতান। মধুর সঙ্গীতের মত। তারই শব্দ শুনতে শুনতে আমরা বিভোর হয়ে পড়েছিলাম। এই ভাবে কতক্ষণ কাটল জানিনে। হয়তো প্রায় আধঘণ্টা হবে। তারপর হঠাৎ পাশ থেকে কার যেন অস্ফুট শব্দ শুনতে পেলাম। তাকিয়ে দেখি জার্মান সৈনিকটি মাথা নীচু করে কী যেন বলছে। শুনতে পেলাম লোকটা বলছে···ভগবান আর কতোদিন। কতোদিন শহরের বুকে আলো দেখিনি। হয়ত বছর—হয়ত শতাব্দী হবে। দীর্ঘ ছ'বছর ধরে এই পোষাক ত্যাগ করিনি। এই দীর্ঘদিনে লড়াই করতে কত দেশে গিয়েছি—

বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া…এই সময়ের মধ্যে নিজের পরিবারের মুখ দেখিনি। আর কতদিন এই ভাবে কাটবে।'

লোকটা আপন মনে বলতে থাকে। আমাদের প্রতি তার কোন নজর নেই।

Aber Her Gott, Warum und Warum gibt-es immer krieg (ভগবান, কেন সদা-সর্বদাই এই লড়াই) und Mensch, Warum, Soll man immer kampfen, wenn so fruendlisch leben kann.

(মানুষ কেন লড়াই করে, যখন তারা বন্ধু হিসেবে থাকতে পারে)

সৈনিকটির মনের ব্যথা বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয় না। দীর্ঘ ছ বছর ধরে আজ সে লড়াই করে গেছে। কীসের জন্যে সে জানে না। এই দীর্ঘ-দিনের মধ্যে নিজের স্ত্রী-পুত্র কন্যাকে সে দেখতে পায়নি। তাই সে আজ কাতর মনে ভগবানকে ডাকছে।

ভগবানের কাছে এই কাতর আবেদন শুধু মাত্র এই সৈনিকের নয়—হাজার হাজার জার্মান সৈনিকের। কীসের জন্যে এই লড়াই, ধ্বংস, মৃত্যু। এই কী মানুষের কামনা। এই জন্যেই কী এই সংসারে বেঁচে থাকা।

*　　　　*　　　　*

পরদিন ভোরে আবার আমাদের যাত্রা সুরু হল। ফেরী নৌকা করে কনস্টান্স গ্রামের পানে রওনা হ'লাম। কিন্তু মাঝ পথে সুরু হলো বিভ্রাট। এক জার্মান সৈনিক এসে দাবী করলে আমাদের পাশপোর্ট। যেই দেখলে আমরা ভারতীয়, লোকটা রেগে উঠলো। বললে, অসম্ভব। তোমাদের ওখানে যেতে দিতে পারিনে। মেরসবুর্গ বলে একটা গ্রামের কাছে ফেরী থামান হল। সৈনিকটি বললে, এইখানে তোমাদের নামতে হবে। আমরা যতোই আপত্তি করি সৈনিকটি ততোই রেগে যায়। ভাবলাম এর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। তাই সময় নষ্ট না করে নেমে পড়লাম।

মেরসবুর্গ গ্রামে গিয়ে জার্মান সৈন্যবাহিনীর কম্যাণ্ডাণ্টের সাথে গিয়ে দেখা

করলাম। লোকটা আমাদের কিছুতেই কনষ্টান্সে যেতে দিতে চায় না। অনুপায় দেখে বললাম, আমরা হলাম নেতাজীর লোক।

নেতাজীর নাম করার সঙ্গে সঙ্গে লোকটার ব্যবহারে পরিবর্তন হল। বললে: বেশ যেতে চাইছ, যাও। তোমাদের বাধা দেবো না।

অনুমতি পত্র নিয়ে আবার আমরা কনষ্টান্সের পানে রওনা হলাম। দুপুর নাগাদ এসে কনস্টান্সে পৌঁছলাম। সেখানে এসে খোঁজ করে জানতে পারলাম যে ইনসেল হোটেলে পররাষ্ট্র বিভাগের দপ্তর আছে।

হোটেলে এসে দেখি অবাক্ কাণ্ড। পররাষ্ট্র বিভাগের সবাই জিনিসপত্র গোছাচ্ছে। কাগজপত্র, ফাইল, সব বেঁধে নেওয়া হচ্ছে। দপ্তরের কর্তা আমাদের অভিসন্ধির কথা শুনে বললেন: আমরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এ জায়গা ছেড়ে যাচ্ছি। যদি আসতে চাও আমাদের সঙ্গে তবে আসতে পারো।'

লোকটার কথা শুনে আমরা হতভম্ব। এলাম ভিসা নিতে, এখন লোকটা বলে কিনা চলো ফিরে যেতে। আবার আমাদের মধ্যে পরামর্শ সুরু হল। ভাবি কী করি। মূর্তি বলে: ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। নইলে এই তেপান্তরে বসে মরতে হবে।

ভেবে দেখলাম মূর্তি ঠিকই বলেছে। এই হট্টগোলের মধ্যে অজানা, অচেনা জায়গায় থাকার অনেক বিপদ। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবার মত বুদ্ধিমানের কাজ আর নেই।

* * *

আবার যাত্রা সুরু হলো। এবার উল্টো দিকে। সারা রাত্রি ভ্রমণের পর ব্রেগনজে ফিরে এলাম। কিন্তু এবার আমাদের নসীব ছিল খারাপ! এসে দেখি কোন হোটেলে একেবারে স্থান নেই। মূর্তি নিজেকে মহারাজা বলে পরিচয় দিলে। কিন্তু কে আমাদের কথা শোনে। সবাই নিজের তালে ব্যস্ত। অন্যের পানে নজর দেবার সময় নেই। প্রতিদিনই জার্মানির চারদিক থেকে শরণার্থী এসে জড়ো হচ্ছে। এই শরণার্থী দলের ভেতর আছেন সব

হোমরা-চোমরা, দেশনেতা, বড়ো-বড়ো সরকারী কর্মচারীর দল। এর তুলনায় আমরা তো নগণ্য।

ব্রেগনজে একদিন কিতাহারার সঙ্গে দেখা। আমায় বললে, জানো মুখুজ্যে, মার্শাল পেঁত্যা এইখানে এসেছেন।

কিতাহারার কথা বিশ্বাস করতাম না যদি না সেদিন বিকেলে সচক্ষে মার্শালকে দেখার সুযোগ হতো। হোটেল 'ভাইসক্রয়েজে' কী একটা কাজে এসেছিলাম। হঠাৎ লিফটের সামনে এসে দেখি ছোট এক জনতা। একটা বুড়ো লোককে ঘিরে আছে জনা কুড়ি পঁচিশ লোক। পাশের একজন বললে: মার্শাল পেঁত্যা।

আমি বিস্মিত চোখে তাকিয়ে দেখলাম বুড়ো লোকটাকে। মার্শাল পেঁত্যা। এতোদিন শুধু নাম শুনে এসেছি, নিজের চোখে দেখিনি।

শুধু পেঁত্যা নয়, একটু বাদে ভিসী সরকারের অন্য মহারথীরা নেমে এলেন।

* * *

ব্রেগানজে বড়ো বড়ো মহারথীদেব ভীড় দেখে বুঝতে অসুবিধে হল না যে লড়াই প্রায় শেষ হয়েছে।

সবাই এখন নিজেদের জীবন বাঁচাবার জন্যে ব্যগ্র। তবু একটা জিনিস দেখে বিস্মিত হলাম। লড়াই সমাপ্তপ্রায় কিন্তু তবু এখনও হাটবাজারে ব্ল্যাকমার্কেট দেখা দেয়নি।

এখনও কুপন দিয়ে জিনিসপত্র কিনতে পারা যায়। খাবার দাবার, পোশাক পরিচ্ছদ সবই মেলে।

* * *

দিন যতোই যায় আমাদের জীবন ততোই দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। জার্মানী থেকে বেরুবার জন্যে আমরা নিত্যি ফিকির খুঁজি। ,কিন্তু কোথায় যাই, এই আমাদের ভাবনা। সুইজারল্যাণ্ডে যেতে হলে সে দেশের ভিসা চাই। কিন্তু

এ সঙ্কটমুহূর্তে কে দেবে আমাদের ভিসা। শেষ অবধি আমরা এক জাপানী বন্ধুর শরণাপন্ন হলাম। তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম সুইস কনস্যুলারের দপ্তরে।

কনস্যুলার আমাদের স্পষ্ট বললেন: দিতে পারি ভিসা। কিন্তু তার আগে জার্মান সরকারের 'এক্সিট' ভিসা চাই।

কী আর করি। বাধ্য হয়ে আবার জার্মান সরকারের কাছে ধর্ণা দিলাম। নিকটেই জার্মান পররাষ্ট্র বিভাগের এক দপ্তর ছিলো। সবাই মিলে সেখানে গেলাম।

পররাষ্ট্র বিভাগের কর্মচারিটি ছিল ভারী ভাল লোক। এক কথায় 'এক্সিট' ভিসা দিতে রাজী হলেন। ভিসা দিতে গিয়ে তিনি প্রায় কেঁদে ফেললেন। বলতে লাগলেন: জর্মানীর পরাজয়, অসম্ভব। মন একথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। জার্মানীর বাইরে যেতে চাইছ, যাও। আমরা আপত্তি করব না। বিদেশী যারা এই ভিসা চাইছে, আমরা তাদের বিনা আপত্তিতে ভিসা দিচ্ছি।

কর্মচারীটির কথা শুনে মন খুশী হল। যাক্ এবার তাহলে সুইস দেশে যেতে পারব।

জার্মান এক্সিট ভিসা নিয়ে এবার আমরা ট্রেনে চেপে বসলাম। এই ট্রেনে করে আমরা জার্মান সীমান্তে যাবো। সেখান থেকে সুইস দেশে। কিন্তু সীমান্তে এসে আমাদের নিরাশ হতে হল। সুইস গার্ড আমাদের ফেরত দিলে। কোন কারণ বা কৈফিয়ৎ দিতে সে রাজী নয়। 'যেতে দেব না' এই তার বক্তব্য।

ইতিমধ্যে মৃতি এক জার্মান গার্ডের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিয়েছে। গার্ড মৃতিকে বললে. নিরাশ শুধু তোমরাই হওনি। এর আগে আরো অনেকে ব্যর্থ হয়ে গেছে। ফ্রন্টিয়ার পার হবার একটা উপায় তোমাদের বাৎলে দিতে পারি। কিন্তু কাজটা কঠিন। পারবে?

সে বললে: লুসতেনাউর কাছে নিরিবিলিতে সীমান্ত পার হবার একটা

জায়গা আছে। কিন্তু কাজটা দুঃসাহসিক এবং পার হতে হবে মাঝরাত্রিরে, সুইস সীমান্তের গার্ডরা যখন ঘুমিয়ে থাকে।

মূর্তি বলে, উপায় নেই মুখুজ্যে সাহেব। চোরের মতোই আমাদের সীমান্ত পার হতে হবে। দ্বিধা করলে বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না।

মূর্তির পীড়াপীড়িতে শেষ অবধি গা ঢাকা দিয়ে সীমান্ত পার হতে রাজী হলাম। নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে রইলাম। সন্ধ্যা পার হয়ে রাত এল। দূর থেকে ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ ভেসে এলো। কিন্তু মূর্তির জার্মান গার্ড বন্ধুর দেখা নেই। রাত পার হয়ে ভোর এল। আমরা যেই তিমিরে, সেই তিমিরেই রইলাম।

চোরের মত সীমান্ত পার হবার লোভে জিনিসপত্র জলাঞ্জলি দিয়েছিলাম। থাকবার মধ্যে ছিলো দুএকটা ছোট স্যুটকেশ, টয়লেটের জিনিসে ভর্তি। সেই নিয়ে আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলাম।

* * *

লুসতেনাউতে এবার আড্ডা গাড়লাম। তার অবশ্যি একটা কারণ ছিল। এখানকার স্টেশনে শরণার্থীর বিশেষ ভীড় নেই। বেশ নিশ্চিন্দিমনে স্টেশনে ঘুমুনো যায়।

এই ভাবে আরো কয়েকটা দিন কেটে গেলো। যাবার কোন সুবিধেই করতে পারলাম না। ইতিমধ্যে শুনতে পেলাম যে মিত্রশক্তি জার্মানীর বড়ো বড়ো শহর দখল করে লুসতেনাউর পানে এগিয়ে আসছে। খবরটা শুনে আমরা চঞ্চল হয়ে উঠলাম। আর দেরী নয়। যেমনি করে হোক জার্মান প্রান্ত পার হতে হবে। নইলে মিত্রশক্তির হাতে গ্রেপ্তার অনিবার্য।

আমি যখন সাতপাঁচ চিন্তা করছি, মূর্তি এসে এক আশার বাণী শোনালে। বললে মুখুজ্যে সাহেব, একটা উপায় পেয়েছি। সাঁতার জানেন।

মূর্তির প্রশ্ন শুনে আমি অবাক। সাঁতার? সে আবার কী জন্যে? ডাঙ্গা পার হতে সাঁতারের কী প্রয়োজন।

মূর্তি হয়তো আমার মনের কথা বুঝতে পারে। বলে: আমরা ডাঙ্গা পার

হচ্ছি না নদী পার হব। এক জার্মান গার্ডকে ধরেছিলাম। লোকটা বলে কী জানেন, যদি সাঁতার কাটতে পারো তো এস আমার সঙ্গে। রাইন নদী পার হতে পারলে সুইস প্রান্তে যাওয়া অতি সহজ কাজ। কিন্তু মুখুজ্যে সাহেব আমি যে সাঁতার জানিনে। কী করবো?

শেষের কথা কয়েকটি মূর্তি বেশ দুঃখের সঙ্গেই বলে। আমি ওর মনের কথা বুঝতে পারি। বলি: বেশ একটা ভেলা বানিয়ে নাও। আমাদের জামা কাপড় সব ভেলার ভেতর রাখব। আর ঐটে ধরে তুমি স্বচ্ছন্দে রাইন নদী পার হতে পারবে।

আমার প্রস্তাব মূর্তির মনঃপুত হল। বললে: ঠিক বলেছেন। ভেলার সাহায্যেই আমরা নদী পার হব।

মূর্তি গিয়ে তার জার্মান গার্ড বন্ধুকে বললে: আমরা প্রস্তুত রাইন নদী সাঁতরে পার হতে।

জার্মান গার্ডটি আমাদের হোকমত বলে একটি জায়গায় নিয়ে এলো।

সেদিনকার কথা আমার আজও স্মরণ আছে। গভীর রাত্রি, আমরা সবাই এলাম রাইন নদীর পাড়ে। মনে পড়ল এর আগে রাইন নদীর পাড়ে এসেছিলাম কাব্য করতে, কিন্তু আজ! আজ এসেছি চোরের মত এই নদী সাঁতরে পার হতে।

জার্মান গার্ডটি বললে: তোমরা একটু সবুর কর। আমি দেখে আসছি নদীর ওধারে কোন সুইস গার্ড আছে কিনা।

যাচাই করে দেখবার জন্যে গার্ডটি এবার নদীর ভেতর ইট ফেলতে লাগল। কিন্তু অপর প্রান্ত নিস্তব্ধ, নীরব। বুঝতে পারলাম ওপারে বিপদের আশঙ্কা নেই।

রাইন নদীর এ অঞ্চলটাই সবচাইতে সরু। কাজেই নিশ্চিন্দি ছিলাম যে পার হতে বেশী সময় নেবে না।

এবার সবাই দুর্গা দুর্গা বলে নামলাম। প্রথমে আমি, তারপর ফ্রেডা। ঠিক হল মালপত্র নিয়ে আমরা প্রথমে নদী পার হব। তারপর ভেলা

করে মূর্তি নদী পার হবে। মূর্তি এসে আমাদের সাথে জুরিখে মোলাকাৎ করবে।

*   *   *

ডিটেকটিভ উপন্যাসে লোমহর্ষক বহু কাহিনী পড়েছি কিন্তু কখনও কল্পনা করিনি যে আমার জীবনেই এমনি এক এডভেঞ্চার ঘটবে।

ঠাণ্ডা জলে নামতেই শরীরের ভেতর দিয়ে এক শিহরণ বয়ে গেল। একটুখানি জলে থাকার পর ঠাণ্ডা ভাবটা কেটে গেল।

নদী পার হতে বেশী সময় নিলোনা। হয়তো মিনিট কুড়ি কিংবা আধঘণ্টা। ওপারে পৌছেই ভেলাটাকে ঠেলে মূর্তির কাছে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর জামাকাপড় পালটে নিলাম। চারদিক নীরব—এমনকি ঝিঁঝিঁ পোকারও শব্দ নেই। আমাদের ভয় কেটে গেল। যাক্ তাহলে সুইস প্রহরীর নজর এড়ান গেছে।

আবার আমরা আমাদের স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছি এই ভেবেই খুশি হলাম।

এবার আমরা জুরিখের পানে হাঁটা দিলাম।

*   *   *

গভীর রাত্রি। চোরের মত আমি আর ফ্রেডা এগিয়ে চলেছি অজানার পানে। অন্ধকারে ভাল পথঘাট চেনা যায় না। এছাড়া ঝোপ-জঙ্গল তো আছেই। কিছুক্ষণ হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একজলার ভেতর গিয়ে আছাড় খেলাম। জুতোটা গেল খসে। খানিকক্ষণ খোঁজাখুজির ভেতর জুতোর সন্ধান পেলাম কিন্তু পরতে গিয়ে দেখি জলে ভিজে একেবারে ভেঁপসে গেছে।

কী করি জুতো নিয়ে, এবার এই ভাবনা শুরু হলো। সময় নষ্ট করার যো নেই। একটু দেরী হলেই সুইস প্রহরী এসে পাকড়াও করতে পারে। তাই ভিজে জুতো পায়ে দিয়ে হাঁটা শুরু করলাম।

একটু হেঁটে যেতেই আর এক বিপদ দেখা দিল। একটা বাড়ির সামনে গিয়ে দেখি একদল গরু। ঘুমুচ্ছিল কিন্তু আমাদের পায়ের শব্দ শুনে চমকে

উঠল। তারপর শুরু করলে ডাক। আমরা বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম, এবার আর রক্ষে নেই। গরুর ডাক শুনে বাড়ির কর্তা হয়ত ছুটে আসবেন—তারপরেই আসবে গাঁয়ের চৌকিদার। আর আমাদের ভাগ্যে জুটবে কয়েদখানা।

ভয়ার্ত হয়ে আমরা দৌড়ুতে শুরু করলাম। একটুখানি দৌড়বার পর খোলা মাঠে এসে পৌছলাম। পেছনে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই। সামনে শুধু মাঠ। এবার অনেকটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক্ আর বিপদ নেই।

* * *

রোরসাক বলে একটা জায়গা আমাদের জানা ছিল। সেখান থেকে ট্রেনে করে জুরিখে যাওয়া সহজ। ঠিক করলাম ভোর হবার আগেই আমরা রোরসাকে পৌছব। ঘণ্টা দু'যেক হাঁটার পর আমরা যখন একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তখন বৃষ্টি শুরু হলো। সে আর এক ঝামেলা। ধারে কাছে কোথাও আশ্রয় নেই। সামনে ছিল একটা গাছ। তারই নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু বেশীক্ষণ দেরী করা সম্ভব নয় কারণ সূর্যি উঠবার আর বেশী বাকী নেই। তাই বৃষ্টি একটু থামতেই আমরা আবার হাঁটা শুরু করলাম।

এমনি করে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর আমরা একটা ছোট গাঁয়ের কাছে এসে পৌছলাম। তখন ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। ধীরে ধীরে বাড়িগুলোতে কর্মতৎপরতা দেখা দিয়েছে।

আমরা তখনও রোরসাক থেকে দূরে। কিন্তু দূরত্ব কতোটা যাচাই করার উপায় নেই। অথচ এভাবে বেশীক্ষণ আর চলা যায় না। প্রথমতঃ আমরা ক্লান্ত, দ্বিতীয়তঃ আমাদের মলিন পোষাক প্রহরীর নজর আকর্ষণ করতে পারে। বড় রাস্তা দিয়ে হাঁটলে পর বিপদ আরো বাড়তে পারে। কিন্তু শেষে আবার অনেক গবেষণার পর একটা ছোট রাস্তা ধরলাম।

সারাটা ভোর হাটার পর আমরা হাইডেন বলে একটা গ্রামে এসে পৌছলাম। জিজ্ঞাসাবাদের পর জানতে পারলাম যে আমাদের গন্তব্যস্থল রোরসাক বেশী দূরে নয়। কিন্তু দিনের বেলা ভবঘুরের মতো হেঁটে বেড়ানোর

অনেক অসুবিধে। প্রহরীর নজরে পড়তে পারি। এ ছাড়া এতোখানি হাটার পর আমরা বেশ ক্লান্তও হয়ে পড়েছিলাম। এর সঙ্গে খিদেও ছিলো বটে। তাই ছোট একটা রেস্তুরান্তে বসে কফির অর্ডার দিলাম।

রেস্তুরান্তের মালিক আমাদের ভারী আদর যত্ন করলে। কেন জানি নে? হয়ত আমাদের জীর্ণ, মলিন পোষাক দেখে। ভেবেছিলো আমরা ভিখিরী।

রেস্তুরান্তের মালিকের প্রসন্ন ভাব দেখে সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম: আচ্ছা এখানে ট্যাক্সী পাবো।

মালিক জিজ্ঞেস করে: আলবৎ পাবে। কিন্তু কোথায় যাবে।

সাঁগেলেন—আমি জবাব দিই।

লোকটা জবাব দেয়: পাবে, নিশ্চয় পাবে। এ দেশে টাকা ফেললে কী না পাওয়া যায়।

ট্যাক্সী যোগাড় করা গেলো। সেই করে আমরা এলাম সাঁগেলেন স্টেশনে। কিন্তু তারপর আবার শুরু হলো ভাবনা। কী করে জুরিখে যাই। ট্রেন না ট্যাক্সী। ট্রেনে যাবার বিপদ অনেক। ধরা পড়বার সম্ভবনা বেশী। কিন্তু ট্যাক্সীতে বিস্তর খরচ। আমাদের ট্যাঁকেও বিশেষ পয়সা কড়ি নেই। অনেক গবেষণার পর ঠিক করলাম এ ক্ষেত্রে ট্যাক্সীই শ্রেয়!

জুরিখে এসে আমাদের চিন্তা ভাবনা বাড়লো। এতোদিন লুকিয়ে সীমান্ত পার হবার উত্তেজনায় দিন কটিয়েছি। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিনি। ভাবিনি কী করে দিন গুজরান করবো, কোথায় থাকবো। জুরিখে এসে এবার সব ভাবনা শুরু হলো।

জুরিখে আমার এক পরিচিত বন্ধু ছিলো। ঠিক করলাম তাকে খুঁজে বের করতে হবে। ঠিকানা জানা ছিলো। ট্যাক্সী করে তার বাড়ীতে গেলাম। কিন্তু সেখানে নিরাশ হতে হলো। গিয়ে দেখি কেউ নেই। কনসিয়ার্জ জানালে আমার বন্ধু বেশ কিছুদিন আগেই জুরিখ ত্যাগ করে চলে গেছেন।

কোথায়? প্রশ্ন করলাম।

কনসিয়ার্জ নীরস কণ্ঠেই জবাব দিলে : জানিনে।

এবার কোথায় যাই। ভাবনা শুরু হলো। বিদেশে এক বন্ধু ছিলো তিনিও আজ জুরিখের বাইরে।

চিন্তা করে সমস্যার সমাধান হয় না। আমাদেরও হলো না। বরং আমাদের দুর্ভাবনা বাড়লো। হাতের পয়সা কড়িও ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে। এ ভাবে আর কয়েকদিন কাটালে পর শিগগিরই উপোষ করতে হবে।

অনেক ভেবে ঠিক করলাম এ অবস্থায় ব্রিটিশ দূতাবাসের সাহায্য নেয়াই শ্রেয়ঃ। হাজার হোক আইনতঃ আমি ব্রিটিশ সরকারের প্রজা। তার কাছে আমার সাহায্য চাইবার অধিকার আছে।

বেশ শঙ্কিত মনেই আমি জুরিখে ব্রিটিশ কনসালের কাছে টেলিফোন করলাম। টেলিফোন করতে প্রথমতঃ বেশ ভয় হলো।

ইডেন হোটেল থেকে টেলিফোন করলাম।

কনসাল সাহেবকে তাড়াহুড়ায় কী বলেছিলাম জানিনে।

তিনি আমার সমস্ত কথা শুনে জবাব দিলেন কিছু হবে না। হ্যাঁ, ভালো কথা। ভবিষ্যতে টেলিফোনে কথা বলতে হলে আর একটু ভদ্র ভাবে কথা বলো, এই বলেই টেলিফোনের কনেকসন কেটে দিলেন।

সাহায্যের শেষ আশাটুকুও নিভে গেলো।

* * *

ইতিমধ্যে আমার ও ফ্রেডার খিদেয় প্রাণ জ্বলছে। বড়ো রেস্তুরাস্তে গিয়ে খরচ করবার মতো সামর্থ্য আমাদের নেই। তাই খুঁজে খুঁজে ছোট একটা ক্যাফে বের করলাম। সেখানে গিয়ে কফির অর্ডার দিয়ে দুজনে বসলাম।

তখন প্রায় সন্ধ্যা। বিস্তর লোক ক্যাফেতে আসছে যাচ্ছে। সবাই গল্প গুজবে মশগুল। ধরা পরবার ভয়ে আমরা সবাইকে এড়িয়ে চলি। আমরা জুরিখের বাসিন্দা নই এ কথাটা সহজেই প্রকাশ হতে পারে। অতএব চুপ করে থাকাই এ ক্ষেত্রে বুদ্ধিমানের কাজ।

এমনিভাবে গেলো সন্ধ্যা। এলো মাঝরাত্রি। এক কাপ কফি শেষ করে

নিলাম দু কাপ। তারপর এমনি করে সময় কাটালাম। কিন্তু মাঝ রাত্রের একটু আগেই ক্যাফের মালিক বললেন: এবার দোকান বন্ধ হবে।

বাধ্য হয়ে আমরাও রাস্তায় বেরুলাম।

আজ জুরিখ দেখে মনে হলো আমরা যেন এক নতুন পৃথিবীতে এসেছি। এখানে রাস্তা জনগণের কোলাহলে মুখরিত। কেউবা সিনেমা দেখে বাড়ী ফিরছে কেউবা রেস্তুরান্তে যাচ্ছে। বহুদিন এমনি খুশিতে ভরপুর জনতা দেখিনি। বহুদিন দেখিনি লোকের মুখে হাসি।

আমরা গিয়ে খানিকটা সময় জুরিখ স্টেশনে কাটালাম। একটার পর একটা ট্রেন আসছে যাচ্ছে। যাত্রীর কোলাহলে প্ল্যাটফর্ম মুখরিত। হকারের দল চা গরম আর বিয়ার বিক্রী হচ্ছে।

এমনিভাবে কাটল ঘণ্টা দুয়েক। একটু বাদে রাস্তার জনতা ক্ষীণ হয়ে এল। ঠাণ্ডা বাতাসও বইতে শুরু করলে। কিন্তু আমরা কী করি? কোথায় যাই। মাথা গুজবার কোন ঠাঁই নেই, রাস্তায় হাটবার মত শক্তি নেই। ফ্রেডাও তার সমস্ত সামর্থ্য হারিয়েছে। একটানা প্রায় দেড়দিন অনাহারে হাটার জন্যে শক্তি চাই। তার দুরাবস্থার জন্যেই আমিই দায়ী। আমার অনুরোধেই সে আজ জুরিখে এসেছে।

দুর্ভাবনাব হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে আমি ফ্রেডাকে বললাম: আর পারছিনে। আজকের রাতটা অন্তত: কোথাও কাটাতে হবে। সে রাস্তায় হোক বা পুলিশের হাজতেই হোক। রাস্তায় থাকা অসম্ভব। বাইরে কনকনে হাওয়া বইছে। এর চাইতে হাজত বাস অনেক শ্রেয়:।

আমার প্রস্তাবে ফ্রেডা রাজী হল। পুলিশের শরণাপন্ন হতে তার মন চাইছিল না। কারণ এ সাহায্যের কী পরিণাম ফ্রেডা জানে। তবু উপায় নেই। মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষে পাবাব একমাত্র উপায় হল পুলিসের দপ্তরে ধর্ণা দেওয়া। আমি এবার তাই করলাম।

সামনেই একটা থানা ছিল। সেখানে গিয়ে এক প্রহরীকে আমাদের দুরবস্থার কথা জানালাম।

বললাম : আমরা পলাতক। জার্মানি প্রান্ত থেকে এসেছি। সাহায্য চাই।

প্রহরী গিয়ে তার মনিবকে খবর দিলে। এবার একজন পদস্থ কর্মচারী আমাদের জেরা করতে নেমে এলেন। একটু বাদেই আমাদের কাহিনী সমস্ত থানার ভেতর এক আলোড়ন শুরু করলে। আমাদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে আরও কয়েকজন পুলিশ এগিয়ে এল। সবাই শুরু করলে প্রশ্নবান। কী আমাদের অভিসন্ধি···ইত্যাদি ইত্যাদি।

পুলিশ কর্মচারিটি কিন্তু শুধু আমাদের প্রশ্নবাণেই রেহাই দিলেন না। রীতিমত গালিগালাজ শুরু করলেন।

একটু বাদে তার রাগের কারণটা বুঝতে পারলাম। ফ্রেডা মেমসাহেব— আর আমি হলাম এক কালো ভারতীয়। আমি কিনা এক মেমসাহেবকে নিয়ে পালাচ্ছি। সত্যিই এ আমার আস্পর্ধাই বলতে হবে। পুলিশ কর্মচারী ফ্রেডাকেও রেহাই দিলেন না। একজন ইউরোপীয়ান মেমসাহেব কী করে একজন কাল ভারতীয়ের সঙ্গ নিতে পারে এ তিনি ভেবেই পাচ্ছেন না।

লোকটার কথাবার্তা শুনে রাগে আমার গা জ্বলতে লাগল। আমার মনের রাগ হয়তো ফ্রেডা বুঝতে পারে। বলে : মুখুজ্যে, চুপ করে বাঁদরটার গালিগালাজ হজম করো। আজ আমরা নিরুপায়। এর ধমক শোনা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই।

লোকটা কিন্তু গালিগালাজের তুফান উড়িয়ে চলেছে। ভারতবর্ষ, গান্ধী আর আমি হলাম তার গালিগালাজের বস্তু। তার কথায় মনে হল আমার জন্যেই যেন সমস্ত বিশ্বসংসার রসাতলে যাচ্ছে। এ সংসারে যদি আমি না থাকতাম তাহলে এ-হতো স্বর্গপুরী।

একটু বাদে লোকটা ফ্রেডাকে পাশের এক ঘরে নিয়ে গেল। তারপর আধঘণ্টা বাদ ফিরে এল।

মুখে তার হাসিখুশি ভাব। যেন এক গোপন চক্রান্ত আবিষ্কার করেছে। কোনো ভূমিকা না করে বললে : ভারতীয়রা জার্মানদের হয়ে লড়াই করেছে।

আমি দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিই : না, আমাদের দেশের সংগ্রামের জন্যে লড়াই করেছি।

লোকটা বুঝতে পারলে যে বুদ্ধিতে আমি তার চাইতে অনেক বেশী পাকা পোক্ত। তাই একটু গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলে : বেশ চালাকের মত জবাব দিচ্ছ তো। তোমাকে প্রশ্ন করে লাভ নেই। তুমি যেতে পারো।

এই বলে একজন প্রহরীকে ডাকলে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম : ফ্রেডা, তার কী হবে? আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়তো সে দরকার মনে করলো না।

আমি প্রথমটায় ভেবেছিলাম মুক্তি পেয়েছি। তারপরে দেখলাম যে আমার ধারণা ভুল। প্রহরী এসে আমাকে এক ছোট ঘরে নিয়ে গেলো। বললে : এইখানে তোমায় থাকতে হবে। তার একটি বিছানাতে আমি ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিলাম। একটু বাদেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

*   *   *

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেডার খোঁজ করলাম। প্রহরী বললে ফ্রেডাকে মেয়ে মহলে বন্দী করে রাখা হয়েছে। ভয়ের কোন কারণ নেই। খবরটা শুনে একটু নিশ্চিন্ত হলাম। দুদিন বাদে আবার আমার পুলিশের বড় কর্তাদের ঘরে তলব হল। শুরু হল জেরা। নানা প্রশ্ন। সব শেষে রায় বেরুলো যে আমায় অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হবে। আর ফ্রেডাকে জার্মানিতে ফেরৎ পাঠান হবে।

বিকেল নাগাদ ফ্রেডার সাথে দেখা হল। কারণ ফ্রেডার দুঃখের জন্যে আমিই দায়ী। তবু উপায় নেই। আজ আমরা বন্দী। আদেশ পালন করতে হবে।

ফ্রেডা চলে গেল জার্মানিতে। বিকেল নাগাদ আমি এলাম শরণার্থীদের ক্যাম্পে।

ক্যাম্প দেখে আমার চক্ষুস্থির। হট্টগোল, চীৎকার ও দুর্গন্ধে আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। কুম্ভমেলার মত এখানেও অজস্র জনতা। বিভিন্ন

জাত, ভাষাভাষী লোক। কোথাও শোবার জায়গা নেই, এমনকি বসবারও নয়। ক্যাম্প কম্যাণ্ডাণ্টকে প্রশ্ন করলাম : কোথায় যাবো ?

লোকটা নির্লিপ্তকণ্ঠে জবাব দিলে : যেখানে খুশী।

নিরুপায় হয়ে ক্যাম্পের চারদিকে ঘুরতে শুরু করলাম। যদি কোথাও ভাল জায়গা মেলে।

এই সুযোগে ক্যাম্পটাও একটু ভাল করে দেখা গেল। বিরাট এক স্টেডিয়াম। তার ভেতর সবাইকে পুরে রাখা হয়েছে। তু তিনটে ফ্লাড লাইট দিয়ে সমস্ত জায়গাটা আলোকিত। চারিদিকে তার দিয়ে ঘেরা। বাইরে প্রহরী। বহির্জগতের সাথে কথা বলবার সুবিধে নেই।

সন্ধ্যা নাগাদ খাবার এল। স্যুপ আর কয়েক টুকরো রুটি। সেই দিয়ে পেট ভরতে হল। যারা পশ্চিম ইউরোপ থেকে এসেছে তাদের জন্যে অবশ্যি একটু ভাল বন্দোবস্ত। কিন্তু যারা রাশিয়া প্রান্ত থেকে আমদানী তাদের সাথে দুর্ব্যবহারের উল্লেখ না করলেই চলে।

আমি যখন উদাস সন্ন্যাসীর মত ঘুরছি তখন একদল ডাচ শ্রমিক আমাকে তাদের কাছে ডাকলে। বললে : এস। আমাদের এখানে একটু শোবার জায়গা আছে।

তারপর একটা কম্বল দিয়ে বললে : এটা নাও নইলে গায়ে ঠাণ্ডা লাগবে।

লোকগুলোর ভারী মিষ্টি ব্যবহার। বিশেষ করে এই তুর্দিনে ওদের সাহায্য ভুলবার নয়। ধন্যবাদ জানালাম। বললাম : তোমাদের দয়ার কথা ভুলব না।

লোকগুলো হাসল। ভাবটা এই রকম যে আজ এই দুঃখের দরিয়ায় আমরা সবাই একই পথের পথিক।

স্টেডিয়ামের লাইট জ্বলছে। সেই তীব্র আলোর ভেতর চোখ বুজবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। ঘুম এল না। শুধু আলোর ব্যাঘাতে নয়। চারদিক থেকে ভেসে আসছে নাকের গর্জন, আর নিঃশ্বাসের শব্দ।

এই গভীর রাত্রে আজ আমি সবাইকে বেশ ভাল করে দেখতে পেলাম। যতোদূর চোখ যায়, দেখতে পেলাম জনতার সমুদ্র। নিশ্চিন্ত মনে সবাই ঘুমিয়ে আছে। বেড়াজালের ভেতর আজ সবাই নিশ্চিন্ত। মৃত্যুর আশংকা নেই। ভাবতে অবাক লাগে এরাই একদিন হিংস্র পশুর মত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে এরাই তুলেছিল মৃত্যুর ধ্বজা। মানুষের এই পরিবর্তন, এই হিংসা ভালোবাসার জুয়োখেলা সত্যিই বিচিত্র; আমার কাছে বিস্ময়ের বস্তু।

* * *

এমনিভাবে জুরিখের বন্ধ খাঁচায় আটকে রইলাম বেশ কিছুদিন। প্রতিদিনই মুক্তির প্রতীক্ষায় থাকি কিন্তু প্রতিদিনই আমাদের নিরাশ হতে হয়। কিছুদিনের মধ্যে আমরা শহরের দেখবার বস্তু হয়ে রইলাম। ছেলে-বুড়ো সবাই দল বেঁধে দেখতে আসতে লাগল। যেমনি সবাই যায় চিড়িয়াখানা দেখতে।

একদিন এই দর্শকদের মধ্যে এক পরিচিতের মুখ দেখতে পেলাম। আমার কলকাতার বন্ধু রবীন সেন এল আমার সাথে মোলাকাৎ করতে। লোক পরস্পরায় শুনতে পেয়েছিল আমি এই চিড়িয়াখানায় বন্দী হয়ে আছি।

রবীন সেন আমাকে বেড়াজালের ভেতরে দেখে অবাক। বলে: গিরিজা তুই ?

আমার দুঃখের কাহিনী আর বাড়ালাম না। সংক্ষিপ্তে জানালাম কিসের আকর্ষণে এই খাঁচার ভেতর এসেছি। আমার দুঃখের কথা শুনে রবীন সেন বললে: দাঁড়া একটা কিছু বিহিত করতে হবে। আমি আবার দুদিন বাদে আসবো।

রবীন চলে গেল আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এলো আমার ক্যাম্প পরিবর্তনের আদেশ। রবীন আমার সাথে দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তাই আশায় ছিলাম আবার সে আমার সাথে দেখা করতে আসবে। কিন্তু হঠাৎ

ক্যাম্প পরিবর্ত্তনের আদেশ শুনে আমি নিরাশ হলাম। তাহলে কী আমার রবীনের সাথে দেখা হবে না? তবে কী আমার মুক্তির সম্ভাবনা নেই?

ইতিমধ্যে একদিন খবর পেলাম যে লড়াই শেষ হয়েছে। জার্মানী পরাজয় স্বীকার করেছে। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে এসেছেন এডমিরাল ডোয়েনিৎজ।

আমি যাযাবর। দেশ থেকে দেশান্তরে যাই, ঘর ভেঙ্গে ঘর গড়ি। ভাঙ্গা গড়া নিয়ে আমার খেলা। দীর্ঘ পাঁচ বছর একজনকে ছেড়ে অন্যকে ধরেছি। কাউকে আঁকড়ে রাখিনি। আজ এই অতীতের কথা ভাবতে আমার গাটা শিউরে ওঠে। সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে আমি পশ্চিমে এসেছিলাম এদের সভ্যতা, কৃষ্টিকে জানতে। কিন্তু কী পেলাম, কী দেখলাম। পেলাম দুঃখ, দেখলাম অস্ত্রের হানাহানি।

আজ হিসেব নিকেষ, লাভ-লোকসানের বিচার করে লাভ নেই। আজ অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করা বৃথা। বরং ভবিষ্যতের পানে এগিয়ে চলাই ভাল।

যতোদিন লড়াই ছিল ততোদিন ভবিষ্যতের চিন্তা করিনি। আজ যুদ্ধের দামামা শেষ হয়েছে তাই ভাবনা সুরু হল কী করব। যদি সুইস পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাই তবে কোথায় যাব।

রেহাই অবশ্যি সহজে পেলাম না। এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে এলাম। কয়েকদিন এইখানে গতানুগতিকভাবে দিন কাটার পর একদিন পুলিশ আমাকে রেলওয়ে স্টেশনে নিয়ে এলো।

দিনটা ছিল গ্রীষ্মকালের রৌদ্রে দগ্ধ। ক্যাম্প থেকে ষ্টেশন, দূরত্ব বেশী নয় কিন্তু অল্প পথটা হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। সুইস প্রহরী আমার ধীর মন্থর গতি দেখে চীৎকার করে উঠল। একটু বাদে আমার পেছনে এসে তার বুটজুতো দিয়ে ধাক্কা দিলে। আমি রাস্তার পাশে গড়িয়ে পড়লাম। আমার পেছনে ছিল এক চেক বন্দী। তাড়াতাড়ি আমাকে ধরে তুললো।

স্টেশনে এসে দেখি গাড়ী প্রস্তুত। লাইন বেঁধে সবাই দাঁড়ালাম। হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীতে উঠতে হল।

কোথায় যাবো? একে অন্যের পানে তাকাই। কিন্তু সবাই আমার মত অনিসন্ধিৎসু, গন্তব্যস্থল জানবার জন্যে। কিন্তু কেউ জানে না কোথায় যাচ্ছি। দেখতে পেলাম সবার মনই ভারাক্রান্ত, সবাই গম্ভীর। হয়ত এর মধ্যে অনেকেই জীবন সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছেন।

গাড়ী চলতে সুরু করলে। ধীরে ধীরে সুইস প্রান্ত পার হলাম। চোখের সামনে মিলিয়ে গেল আলপ্‌স পর্বত। আমি মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানালাম। বললাম: তুমি যে আমায় সুইস পুলিশের হাত থেকে রেহাই দিয়েছ এর জন্যে তোমায় করি নমস্কার।

*　　　　*　　　　*

নতুন জার্মানি।

চারদিকে ভগ্নস্তূপের রাজ্য, নৈরাশ্যের সমুদ্র।

যে জাতি গর্ব করে বলেছিল 'ডয়েচল্যাণ্ডে উইবার আলেস', যাদের দাপটে পৃথিবীর সমস্ত শক্তি টলমল করে উঠেছিল আজ তারা হয়েছে মূক।

এমনি এক বিষাদের রাজ্যে আমাদের নিয়ে ট্রেন ঢুকল। আমরা যে গ্রামে এসে পৌছলাম, সে এলাকাটা ফরাসী সৈন্যদের দখলে। তাদের হাতেই আমাদের সঁপে দেয়া হল।

এবার সত্যিই আমার একটু ভাবনা শুরু হল। মিলিটারী শাসন, আইন-কানুনের বালাই নেই। দুটো বন্দুকের গুঁতো দিলেই আমাকে পরপারে যেতে হবে। প্রশ্ন করবার কেউ নেই, জানবার কেউ নেই।

কিন্তু তবু প্রথম সম্ভাষণে আমি একটু বিস্মিত হলাম। আমার ক্যাম্প কম্যাণ্ডার আমার মুখে ফরাসী বুলি শুনে হয়ত একটু খুশী হলেন। দুএকটা প্রশ্নবাদের পর সিগারেট দিয়ে বলল: 'সিগ্রেট, সিল ভু প্লে।'

সানন্দে গ্রহণ করলাম।

কম্যাণ্ডার একটা ছোট ঘর দেখিয়ে বললে: এইখানেই থাকো। লিউটেনাণ্টের সঙ্গে তোমার ব্যাপার নিয়ে একটু আলোচনা করতে হবে।

দুদিন বাদে লিউটেনাণ্টের কাছে আমার তলব হল। লিউটেনাণ্টের কাঁচা বয়স। আমার ইতিহাস সে মন দিয়ে শুনলে। তারপর বললে: অসম্ভব, তুমি তো ক্রিমিন্যাল নও।

লিউটেনাণ্টের কথা শুনে আমার হাসি পেল।

দেশের স্বাধীনতা নিয়ে সংগ্রাম করা যদি ক্রিমিনাল হয় তবে দুনিয়ার সবাই ক্রিমিনাল।

লিউটেনাণ্ট একটু ভাবতে সুরু করলে। তারপর বললে: তোমার ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। যাক্ পাশের গ্রামে আমাদের বড়োকর্তা আছেন। তার কাছে তোমার কেস পেশ করব। দেখি তিনি কী বলেন।

পরদিন লিউটেনাণ্ট আমাকে তার বড়কর্তার কাছে নিয়ে গেল। যাবার পথে বললে তার নাম রাসেল। লড়াইর আগে ছিল সে ছাত্র। যুদ্ধ সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে মসী ছেড়ে ধরলে অসী। প্রথমটায় ফ্রান্সে, তারপর লণ্ডনে। শেষে মিত্রশক্তির বাহিনীর সাথে আবার নিজের দেশে ফিরে এল।

রাসেলের বড়কর্তা আমার কাহিনী শুনে একটু ভাবনায় পড়লেন। তার কাছে মনে হল আমার সমস্যা একটু জটীল। তাই চট করে রায় দিতে পারলেন না।

আবার রাসেলের সঙ্গে গাড়ী করে ফিরে এলাম। বড় রাস্তা দিয়ে আমাদের গাড়ী যখন পুরোদমে চলছে তখন রাসেল হঠাৎ প্রস্তাব করলে: আচ্ছা, মুখুজ্যে তুমি তো বেশ ভাল জার্মান বল। আমায় একটু সাহায্য কর না কেন?

রাসেলের প্রস্তাব শুনে আমি হতভম্ব। লোকটা বলে কী? পাগল হয়নি তো। ছিলাম বন্দী, এখন হচ্ছি বন্ধু। একেই বলে নসীব।

রাসেল বললে: মুখুজ্যে, তুমি আমার সঙ্গে থেকে যাও। দেখতে পাচ্ছো তো দিন দিন কত হাজার হাজার জার্মান বন্দী, গ্রামবাসীদের নিয়ে আমায়

কাজকর্ম করতে হচ্ছে। এদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে হলে দোভাষীর প্রয়োজন। আমরা ফরাসী, জার্মান ভাষায় জ্ঞান নেই বললেই চলে। তুমি হবে আমার দোভাষী ? রাজী ?

আমি সানন্দে রাজী হলাম। প্রথম কারণ যে দৈনন্দিন টানা হ্যাঁচড়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। কয়েদখানায় ঘানি টানার চাইতে দোভাষীর কাজ অনেক শ্রেয়ঃ।

* * *

নতুন জীবন নতুন কাজে থাকে অনেক আনন্দ। এ আনন্দ থেকে আমিও বঞ্চিত হইনি। গত ছ'বছরের মধ্যে আমার জীবনে দ্রুতলয়ে পরিবর্তন ঘটেছে। প্যারীর জীবন ছিল সাংবাদিকের, তারপর হলাম মাতৃভূমির সৈনিক। এবার স্থরু হলো জীবনের এক নতুন অধ্যায় অর্থাৎ পরাজিত নাগরিক আর যুদ্ধে বিজয়ী সৈন্যের মধ্যে সংযোজনাকারী, ইংরেজী ভাষায় যাকে বলে পাব্লিক রিলেশসন।

যুদ্ধোত্তর জার্মানি। একদিন যার মুখে দেখেছি গর্বের চিহ্ন আজ দেখতে পেলাম করুন, বিষাদ মুখ। একদিন যার কণ্ঠে শুনেছি 'ডয়েচল্যাণ্ড উইবার আলেস' আজ তার কণ্ঠ হয়েছে নীরব। কিন্তু সবদিকে দেখেছি বিনা প্রতিবাদে হাসিমুখে দুঃখকে বরণ করে নিতে।

প্রতিদিন আমার কাছে আসত নাৎসী বন্দী। তাদের প্রশ্নবাদের পর, তাদের অভিযোগ দুঃখদুর্দশার কথা জানাতাম রাসেলকে। তাদের নিয়ে কী করা যায়, সেই কাজের দায়িত্বও একদিন আমার উপর পড়ল।

রাসেলের পাশের ঘরেই আমার থাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল। একদিন কথাচ্ছলে রাসেলকে বললাম আমাদের আজাদ হিন্দ সংঘের কাহিনী, স্থভাষের গল্প।

আমার কাহিনী শুনে রাসেল হতবাক। কিছুক্ষণ বাদে আমার হাত ধরে বললে : মুখুজ্যে, তোমাকে দেখে হিংসে হয়। এমনিভাবে দেশের জন্যে

সংগ্রাম করা সত্যিই গর্বের বিষয়। আমি যদি ভারতীয় হতাম তাহলে এই কাজে আমিও ঝাঁপিয়ে পড়তুম।

রাসেলের মুখে একথা শুনে প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গেলাম। ভেবে ছিলাম ইংরেজদের মত ফরাসীরাও ভাববে আমরা হলাম দেশদ্রোহী কিন্তু আমাদের আজাদ হিন্দ সংঘের প্রশংসা তাদের মুখে শুনতে পাব এটা ছিল কল্পনার অতীত। তাই মনে মনে একটু গর্ব অনুভব করলাম।

* * *

আমি যে সৈন্যবাহিনীর সাথে কাজ করছিলাম তার নাম হল 'ডিয়াবেল রুজ' (রেড ডেভিল)। এর কর্তা হল রাসেল। তিনটে গ্রাম—রাইলাসইঙ্গেন ক্যাঁরলে, ওরবলিঙ্গেন—আর তিন হাজার বাসিন্দে নিয়ে আমাদের কাজ-কারবার।

লড়াই থেমেছে সত্য কিন্তু দেশের মধ্যে তখনও শান্তি ফিরে আসে নি। গ্রামের চতুর্দিকে তখনও রয়েছে বিশৃঙ্খলা। রেলগাড়ী নেই, নেই কোন যানবাহন। অন্যান্য গ্রাম থেকে প্রতিদিন শরণার্থীর দল ভেসে আসছে। উদ্দেশ্য বিহীন, গ্রাম থেকে গ্রামে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের খাবার নেই, নেই তাদের আশ্রয়।

আমাকে শুনতে হত শরণার্থীদের করুণ কাহিনী, শুনতে হতো জননীর ক্রন্দন, দেখতে হতো স্ত্রীর শোক। শুধু তাই নয়, বিজয়ী সৈন্যের উশৃঙ্খলতার শেষ নেই। এছাড়া একদল নাৎসী, গোপনে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে গরিলা যুদ্ধ করছিল। তাদের আক্রমণে মাঝে মাঝে আমাদের বিপর্যস্ত হতে হতো।

কিছুদিন বাদে মিত্রশক্তির সামরিক কর্তৃপক্ষ জার্মান নাৎসী বাহিনীর সমস্ত শাসনতন্ত্রকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু এতেও ছোট খাটো আক্রমণের ভাটা পড়ল না।

গ্রামের শাসনতন্ত্রের দায়িত্ব নিয়ে আমাদের কাজ বাড়ল। নতুন করে আমাদের মিউনিসিপ্যাল কমিটি গঠন করতে হল। নতুন মেয়র নিযুক্ত করলাম। শুধু তাই নয়, ছোটখাটো চুরির মামলার আদালত বসান হল।

বেশ কয়েকদিন পরিশ্রমের পর গ্রামের মধ্যে শান্তি ফিরে এল। ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুল আবার খুললো—কৃষকেরাও চাষ করতে আবার মাঠে ফিরে গেলো।

এ সব কাজের ভেতর আমি যেন এক নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। আমার মনে হল যেন সাধারণ জার্মান নাগরিককে ভাল করে চিনতে পেরেছি।

* * *

গ্রামের শান্তি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাজ বেশ একটু হাল্কা হল। খেলাধূলা করার আর গান বাজনা শোনার সময় মিললো। রাসেল আমাকে প্রায়ই টেনিস খেলতে নিয়ে যেত। প্রায়ই আমাদের ক্যাম্পে পার্টি হত।

আমাদের গ্রামের একটু দূরেই সুইস সীমান্ত। একদিন আমরা রেজিমেণ্টের সঙ্গে মার্চ্চ করে সীমান্ত পার হলাম। রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে ছিলো অগনিত দর্শক। আমাদের দেখে আজ তারা আনন্দে চীৎকার করে উঠল—ভিভলা ফ্রান্স। তারপর গ্রামের টাউন হলে আমাদের অভিনন্দন দে'য়া হল। রাসেল বক্তৃতা দিলে। সেই বক্তৃতার জার্মান তর্জমা আমাকে করতে হলো।

পরদিন গ্রামের দৈনিক কাগজে আমাদের ছবিসহ এক লম্বা ফিরিস্তি বেরুল। সম্পাদকীয়র এক স্তম্ভে রইল আমার প্রশংসা। ভারতীয় দোভাষীর কর্মতৎপরতা, ভাষাজ্ঞান সত্যিই প্রশংসনীয়।

সেদিনকার সম্পাদকীয় পড়ে আমার হাসি পেলো। যে দেশ থেকে আমাকে চোরের মতো শেকল পরিয়ে বের করে দে'য়া হয়েছিল, আজ সেই দেশ থেকে পেলাম অভিনন্দন।

* * *

ইতিমধ্যে জার্মানীর অবস্থা ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠলো। কয়েকদিনের মধ্যেই জার্মান নাগরিকেরা বুঝতে পারলে যে তারা তাদের স্বাধীনতা

হারিয়েছে। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আজ তাদের জীবন অসহ্য হয়ে উঠলো। তারা বলতে শুরু করলে—এতো শান্তি নয় এ হল শাস্তি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে আমার সম্পর্ক ক্রমেই নিবিড় হয়ে উঠল। আমি ভারতীয়—ফরাসী নই, তাই তারা মন খুলে আমার কাছে এসে দুঃখের কাহিনী বলত। কোথাও কোন অত্যাচার, অবিচার হলে আমার সাহায্য কামনা করতো।

এমনি করে কাজের ভেতর দিয়ে দিন কেটে গেল। বর্ষা পার হয়ে এল শরৎ। ক্রমে ক্রমে সামরিক কর্তৃপক্ষ গ্রামের শাসনভার গ্রামবাসীদের উপর তুলে দিলে। মিউনিসিপ্যাল নতুন করে গঠন করা হল—নির্বাচিত হল নতুন মেয়র, নতুন অল্ডারম্যান।

* * *

কাজের হৈ হুল্লোরে অন্য প্রান্তের খবর পাই নি। বার্লিনে হেলমষ্টাডের বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম।

হঠাৎ একদিন রেডিওতে শুনতে পেলাম যে আমেরিকা হিরোসীমাতে অ্যাটম বোমা ফেলেছে। তারই পরিণামে সেই শহর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে জাপান সরকার।

কিন্তু এর কিছুদিন বাদেই এর চাইতে দুঃসম্বাদ পেলাম যে বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষ মারা গেছে। এ সম্বাদ শুনে আমি স্তম্ভিত হলাম। সুভাষের মৃত্যু সংবাদ আমার কাছে ছিলো কল্পনার অতীত। যুদ্ধের শেষে তাঁকে দেখতে পাবো না একথা কখনও চিন্তা করি নি।

ইতিমধ্যে আমার জীবনেও পরিবর্তন ঘটল। গ্রামবাসীদের হাতে শাসনভার তুলে দিয়ে আমাদের সৈন্যবাহিনী অন্যত্র চলে গেল। রাসেল ফ্রান্সে চলে গেল। আমি আবার হলাম বেকার।

* * *

এবার সুরু হল আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা।

আমার সমস্যা ভারতে ফিরে যেতে পারব কিনা। যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে

ইংরেজ। তাই বুঝতে পারলাম যে আমরা যারা আজাদ হিন্দ সংঘের কর্মী তাদের সহজে রেহাই মিলবে না।

একদিন খবর পেলাম যে কংগ্রেস নেতারা জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়েছেন। ব্যস্ এর বেশী খবর পাবার উপায় নেই। সংবাদপত্রে কোথাও ভারতীয় সংবাদ নেই। আমিও দেশ সম্বন্ধে, আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম।

কিন্তু বেশীদিন উৎকণ্ঠার মধ্যে রইতে হলোনা। একদিন নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি খবর এল কলকাতার বুকে সুরু হয়েছে আন্দোলন। সবার মুখে এক ধ্বনি 'আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ, নেতাজী জিন্দাবাদ।' সংবাদপত্রের প্রথম স্তম্ভে রইল আজাদ হিন্দ সংঘের অমর কাহিনী। ক্রমে ক্রমে কলকাতার আন্দোলন ভারতের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। সবার মুখে এক ধ্বনি—নেতাজী জিন্দাবাদ। লাল কেল্লার বিচার, বন্দী আজাদ হিন্দ সৈন্যদের গৌরব কাহিনী সমস্ত ভারতবাসীকে এক নতুন প্রেরণা দিলে।

ইতিমধ্যে লণ্ডনে ইংরেজ সরকারের বহু অদলবদল ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের জায়গায় দেশের শাসনতন্ত্রের কর্তৃত্ব পেয়েছেন এটলী। ভারতের সঙ্গে মীমাংসা করতে তিনি ব্যগ্র।

আমি এবার একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আজাদ হিন্দের কর্মী বলে আজ আমার একটু গর্ব হল। দেশেব স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদের ব্যর্থ হয়নি।

কিন্তু আমার সুখের স্বপ্ন বেশীদিন স্থায়ী রইল না। একদিন প্রভাতে কে যেন আমার দরজায় কড়া নাড়া দিলে। দোর খুলে দেখি ফরাসী গোয়েন্দা বিভাগের এক কর্মচারী। প্রশ্ন করলে : মশিয় মুখুজ্যে।

আমি আস্তে আস্তে জবাব দিই : উই।

কর্মচারিটি বলেন : ভু যেত প্রিস্‌নিয়ে সুলা দিমান্দ দে যাংগলেস (ইংরেজের অনুরোধে তোমাকে বন্দী করা হল।

আমার আবার ঠাঁই হল কারাগারে।

* * *